# সাহিত্য সঞ্চয়ন

## বাংলা (প্রথম ভাষা)

## দশম শ্রেণি

এই পুস্তকটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে
কেবলমাত্র সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

**প্রথম প্রকাশ:** ডিসেম্বর, ২০১৫
**দ্বিতীয় সংস্করণ:** ডিসেম্বর, ২০১৬
**তৃতীয় সংস্করণ:** ডিসেম্বর, ২০১৭

**গ্রন্থস্বত্ব :** পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

**প্রকাশক :**
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

**মুদ্রক :**
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

# ভারতের সংবিধান

## প্রস্তাবনা

**আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে** একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথগ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

# THE CONSTITUTION OF INDIA

## PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

# ভূমিকা

দশম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের বই 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাসাহিত্য পাঠ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার মধ্যেই বিষয়ের সার্থকতা। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে একত্রিত করা হয়েছে 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটিতে। বইটি তাই বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণা জোগাতে বাংলা বিষয়টিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত মানসম্পন্ন বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এই বইটিতে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সেই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয় তার জন্য বইটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটির উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনাশক্তি বিকশিত করা এবং লেখার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্য সঞ্চয়নের পাশাপাশি দ্রুত পঠনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ এবং নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী রচিত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়তে হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পী—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

# প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকের পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। ইতোপূর্বে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্যপুস্তক জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ নথিদুটিকে অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছে। এবার দশম শ্রেণির নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্মিত হলো।

দশম শ্রেণির বাংলা প্রথম ভাষার বইয়ের নাম 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'। পূর্বতন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত ভাবমূল (Theme) সমূহ থেকে নির্বাচিত কয়েকটিকে এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। সাতটি পর্বে বিন্যস্ত এই পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলার অগ্রগণ্য সাহিত্যকারদের রচনায়। অন্যদিকে, অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে ভারতীয় সাহিত্য এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য। 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইয়ের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের সামনে বাংলা সাহিত্যের বহুবর্ণ, বহুবিচিত্র সম্ভারকে পরিবেশন করতে চেয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, দশম শ্রেণির 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটির মাধ্যমে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের গভীর অনুরাগ তৈরি হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পাঠ্যপুস্তক 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'-এর সঙ্গে নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী নির্মিত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থও শিক্ষার্থীদের পড়া আবশ্যক। পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ দ্রুতপঠন বা সহায়ক পুস্তক হিসেবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বইটিকে রঙে-রেখায় অনুপম সৌন্দর্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন বরেণ্য শিল্পী শ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান

'বিশেষজ্ঞ কমিটি'

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০১৭

নিবেদিতা ভবন, ষষ্ঠতল

বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

## বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

**সদস্য**

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)  রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ঋত্বিক মল্লিক  সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়  রুদ্রশেখর সাহা

ইলোরা ঘোষ মির্জা

**প্রচ্ছদ ও অলংকরণ**

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

**পুস্তক নির্মাণ**

বিপ্লব মণ্ডল

# সূচিপত্র

## প্রথম পাঠ


পৃষ্ঠা ১

শাবলতলার মাঠ
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন পাহাড়ের কোলে
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

* জ্ঞানচক্ষু
আশাপূর্ণা দেবী

বুধুয়ার পাখি
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত


## দ্বিতীয় পাঠ


পৃষ্ঠা ১৭

* অসুখী একজন
পাবলো নেরুদা

আমাকে দেখুন
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

* আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি
শঙ্খ ঘোষ

আলোবাবু
বনফুল

পৃথিবী বাড়ুক রোজ
নবনীতা দেবসেন


## তৃতীয় পাঠ


পৃষ্ঠা ৩৬

* আফ্রিকা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোকমাতা রানি রাসমণি
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

* হারিয়ে যাওয়া কালি কলম
শ্রীপান্থ

## চতুর্থ পাঠ

পৃষ্ঠা ৫৬

ভারতবাসীর আহার
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরশমণি
চণ্ডীদাস

সাজ ভেসে গেছে
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

একাকারে
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

* বহুরূপী
সুবোধ ঘোষ

## পঞ্চম পাঠ

পৃষ্ঠা ৮০

* অভিষেক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

* সিরাজদ্দৌলা
শচীন সেনগুপ্ত

* প্রলয়োল্লাস
কাজী নজরুল ইসলাম

* পথের দাবী
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## ষষ্ঠ পাঠ

পৃষ্ঠা ১০৪

প্রভাবতী সম্ভাষণ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

* সিন্ধুতীরে
সৈয়দ আলাওল

* অদল বদল
পান্নালাল প্যাটেল

ঘাস
জীবনানন্দ দাশ

## সপ্তম পাঠ

পৃষ্ঠা ১১৫

মানুষের ধর্ম
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান
রাজশেখর বসু

* অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান
জয় গোস্বামী

* নদীর বিদ্রোহ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

## শিখন পরামর্শ

পৃষ্ঠা ১২৬


[*] চিহ্নিত পাঠগুলি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত

# শাবলতলার মাঠ

## বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দিন পরে শাবলতলার মাঠ দেখলাম সেদিন। আমার পিসিমার বাড়ির দেশে। ছেলেবেলায় যখন পিসিমার বাড়ি থেকে দুর্গাপুর উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালায় পড়তাম সে আজ পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের কথা। পিসিমা মারা যাওয়াতে সে গ্রামে আর যাইনি কখনও।

সেদিন আবার কার্যোপলক্ষে গোরুর গাড়ি চড়ে যেতে যেতে শাবলতলার মাঠ চোখে পড়ল, কিন্তু মস্ত বড়ো কী এক কারখানা হচ্ছে সেখানে। রেল লাইন বসেছে মাঠের ওপর দিয়ে — বড়ো রেল লাইন। কত যে লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি এসে পড়েছে! লোকজন কুলিমজুরের ভিড়, দুমদাম শব্দ, সে কী বিরাট ব্যাপার।

চালাঘর ও তাঁবু চারিধারে। ইন্‌জিনিয়ার-ওভারসিয়ারের দল খেটে খেটে সারা হলো। পাঞ্জাবি কন্ট্রাকটরের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারের খুঁটি বসানো হচ্ছে, ইলেকট্রিকের ও টেলিফোনের তার খাটানো হবে। ইটবোঝাই কাঠ-বোঝাই লরির ভিড় নতুন তৈরি চওড়া রাস্তাগুলোর ওপরে। চুনের ধুলো, সিমেন্টের ধুলো উড়ছে বাতাসে।

এ কী হলো?

আমার সেই ছেলেবেলাকার শাবলতলার মাঠ কোথায় গেল? সত্যিই তা নেই। তার বদলে আছে কতকগুলো তাঁবুর সারি, ইটখোলা, পাথুরে কয়লার স্তূপ, চুনের ঢিবি, কাঠের ঢিবি, লোকজনের হৈ চৈ, লরির ভিড়।

আজ সকালে মার্টিন লাইনের ছোটো স্টেশনে নেমেছি, গোরুরগাড়ি করে চলেছি পিসিমার বাড়ির গ্রামের পাশের একটা গ্রামে মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজতে। রাস্তার ধারে পড়ে শাবলতলার মাঠ। হঠাৎ দেখি এই অবস্থা তার।

গোরুরগাড়ির গাড়োয়ানকে বলি — হ্যাঁরে, এটা শাবলতলার মাঠ, না?

— হ্যাঁ বাবু।

— কী হচ্ছে এখানে?

— কী জানি বাবু, কলকারখানা বসছে বোধ হয়।

— কতদূর নিয়ে?

— তা বাবু অনেক দূর নিয়ে — উই বাজিতপুর, মনসাতলা, ছাওয়াল-মারি, বেদে-পোতা, হাঁসখালির চড়া পর্যন্ত।

— গ্রামগুলো সব কোথায়?

— সব উঠিয়ে দিয়েছে।

মনে পড়ল আমার এগারো বছর বয়সের একটি মধ্যাহ্নদিন। আর মনে পড়ল দুর্গাপুর উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের উমাচরণ মাস্টারকে।

উমাচরণ মাস্টার কতদিন থেকে দুর্গাপুর ইউ পি পাঠশালার হেডমাস্টারি করছিলেন তা আমি বলতে পারব না। গ্রামের রায় জমিদারদের ভাঙা কার্নিসে পায়রার বাসাওলা বৈঠকখানার একপাশে সেকেলে তক্তপোশে ছিল তাঁর বাসা। দেয়ালে তাঁর হুঁকো ঝুলত পেরেকের গায়ে, বাঁশের আলনায় তাঁর দুখানা আধময়লা ধুতি ও এক এবং অদ্বিতীয় পিরানটি আলতো করে ঝোলানো থাকত — আর থাকত তক্তপোশের নীচে একজোড়া কাঠের খড়ম। একটা টিনের বিবর্ণ তোরঙ্গ। একটা চটের-থলে-ভর্তি টুকিটাকি জিনিস। একখানা পাকা বাঁশের লাঠি এবং—সেইটেই বেশি করে মনে আছে—একগাছা তেলে-জলে পাকানো বেত।

উমাচরণ মাস্টার আবার বই লিখতেন। আমি তখন অল্পবয়স্ক, লেখক বা সাহিত্যিকের যশোগৌরব সম্বন্ধে আমার ধারণা তখন অস্পষ্ট—তবুও মাস্টারমশায় যখন ক্লাসের টেবিলের ওপর পা তুলে গম্ভীরভাবে তাঁর লেখা 'আক্কেল গুড়ুম' বই পড়তেন—তখন আমরা ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বিস্ময় ও প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে তাঁর দীর্ঘগুম্ফযুক্ত বসন্তের দাগ-আঁকা প্রৌঢ় মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে থাকতাম।

হ্যাঁ—তাঁর বই-এর নাম ছিল 'আক্কেল গুড়ুম'—তিনি বলতেন 'প্রহসন'। আমার যা বয়স তখন তাতে 'আক্কেল গুড়ুম' বা 'প্রহসন' দুটো কথার একটারও মানে বুঝতাম না। মনে আছে বই-এর মধ্যে একটি ইংরেজি পড়া ছোকরার কথা আছে এবং পড়ার ভঙ্গিতে মনে হতো উক্ত ইংরেজি-পড়া ছোকরা খুব ভালো লোক নয়।

উমাচরণ মাস্টার আমাদের দিকে চেয়ে সগর্বে বলতেন — এই বই পড়ে গোবরডাঙার সেজোবাবুর শালা

কী বলেছিলেন জান? বলেছিলেন, উমাচরণবাবু, আপনি কালে গিরিশ ঘোষের সমান লেখক হবেন। — বুঝলে?

আমি বলেছিলাম — গিরিশ ঘোষ কে পণ্ডিত মশাই?

উমাচরণবাবু অনুকম্পার হাসি হেসে আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন — গিরিশ ঘোষ? জান না? হুঁঃ! কী-বা জান?

আমি লজ্জায় চুপ করে থাকি। কী উত্তর দেবো? যখন সত্যই জানি নে গিরিশ ঘোষ কে, নামও কোনোদিন শুনিনি! উমাচরণ তাঁর এই মূল্যবান প্রহসন আমাদের কাছে বিক্রি করবার চেষ্টা করতেন এবং বিক্রি অনেক করেছিলেনও। প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ি একখানা বা দুখানা করে 'আক্কেল গুড়ুম' ছিলই। মাইনের টাকা দিলে খুচরো ফেরত দেওয়ার রীতি ছিল না তাঁর। বলতেন — কত বাকি? সাত আনা? নাও একখানা ভালো বই নিয়ে যাও। বাড়ি গিয়ে পড়তে দিয়ো সবাইকে।

একদিন পিসিমা বললেন — হ্যাঁরে, মাইনের টাকা দিলাম, ন আনা পয়সা ফেরত দিলি নে?

— না পিসিমা। মাস্টারমশাই বই একখানা দিয়েছেন তার বদলে।

— কী বই?

— আক্কেল গুড়ুম।

— ওমা, সে আবার কী বই? তুই কী বলে সেই বই আনতে গেলি? যেমন পোড়ারমুখো মাস্টার তেমনই পোড়ারমুখো ছেলে! বই-এর নাম শোন না — 'আক্কেল গুড়ুম'। কেষ্টর শতনাম পাওয়া যায় তো একখানা আন গে বরং — ও বই ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

— সে হবে না পিসিমা, তিনি ওসব বাজে বই লেখেন না। এ হলো প্রহসন।

— সে আবার কী রে?

— সে তুমি বুঝবে না? গিরিশ ঘোষের নাম শুনেছ?

— সে কে আবার? আমাদের গাঁয়ে তো ও নামের কেউ নেই। দুগ্‌গোপুরের লোক নাকি?

— সে তুমি বুঝবে না। তিনি আমাদের মাস্টারমশায়ের মতো প্রহসন বই লেখেন।

পিসিমা ধমক দিয়ে বলতেন — তুই চুপ কর বাপু — বড্ড পণ্ডিত হয়েছিস তুই! আমি জানি নে — ওঁর গাল টিপলে দুধ বেরোয় উনি জানেন — ফাজিল কোথাকার! ওসব গিরিশ ঘোষ সতীশ ঘোষ বুঝি নে — কাল ও বই ফেরত দিয়ে কেষ্টর শতনাম আনতে পারিস ভালো, নয়তো ন আনা ফেরত আনবি — যা —

একদিন উমাচরণ মাস্টার মশায় আমাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন, বড়ো বড়ো লেখকরা সবাই প্রথম জীবনে তাঁর মতো ইস্কুল-মাস্টারি করেছিলেন। কথাবার্তার মাঝখানে আমাদের ক্লাসের সারদা হঠাৎ বলে বসল — আপনার বয়স কত মাস্টারমশাই?

— কেন রে?

— তাই বলছি।

উমাচরণ মাস্টার তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম ছেলেটার খটকা

বাধছে কোথায়। এই বয়সেও যদি এখন উমাচরণ মাস্টার আমাদের এই স্কুলে মাস্টারি করতে রয়ে গেলেন, তবে কোন বয়সে গিয়ে তিনি কোথায় কী বড়ো কাজ করবেন? আমাদের ক্লাসের সতু কিন্তু বলত — মাস্টার মশাই খুব বড়ো পণ্ডিত। ওরকম হয় না।

আমি বললাম — কেন রে?

— উনি চালতেবাগানের মাঠের ধারে বসে রোজ কী করেন! বোধ হয় লেখেন। কবিমানুষ কিনা।

আমি একদিন সতুর সঙ্গে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা। চালতেবাগান বহুকালের প্রাচীন আম তেঁতুল গাছের ছায়ায় দিনমানেই সন্ধ্যার মতো অন্ধকার। অনেক রকম মোটা লতা গাছে গাছে জড়াজড়ি করে আছে। বাগান পার হয়েই একটা ছোটো মাঠ, উমাচরণ মাস্টার সে মাঠের ধারে বসে আছেন, বাগানের ছায়ার আশ্রয়ে একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে। মাদুরের ওপর কাগজ বই ছড়ানো। পাছে উড়ে যায় বলে মাটির ছোটো ছোটো ঢেলা চাপানো সেগুলোর ওপর। আমরা শ্যাওড়া ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, তিনি কখনও উপুড় হয়ে কী লিখছেন, কখনও সামনের মাঠের দিকে চেয়ে কী ভাবছেন, কখনও আপনমনে হাসছেন, বিড় বিড় করে কী বকছেন।

সতু সসম্ভ্রমে চুপি চুপি বললে — দেখলি? কবিমানুষ!

আমি বললাম — কী করছেন?

— লিখছেন।

— বিড় বিড় করে কী বকছেন?

— ও রকম কবিরা করে থাকে।

দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে কবির কাণ্ড অনেকক্ষণ দেখলাম। এই আমার জীবনে প্রথম একজন জীবন্ত কবির ক্রিয়াকলাপ দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটল। মনে আছে, শ্যাওড়া ঝোপের পাশেই ছিল বড়ো একটা কতবেল গাছ, তলা বিছিয়ে পড়ে ছিল পাকা পাকা কতবেল। সেই বয়সের লোভ, বিশেষ করে কতবেলের ওপর লোভ দমন করেছিলাম। কবি দেখবার আনন্দে ও বিস্ময়ে। উমাচরণ মাস্টারের বয়স তখন কত? আমার মনে হয় চল্লিশের ওপর। কারণ আমার মায়ের বড়ো ভাই, আমার বড়ো মামা — যাঁর বয়স তখন শুনতাম পঁয়ত্রিশ — তিনি মাস্টারমশায়কে 'দাদা' বলে ডাকতেন।

আমরা যেমন নিঃশব্দে সেখানে গিয়েছিলাম তেমনই নিঃশব্দে চলে এলাম মনে বিস্ময় ও আনন্দ নিয়ে।

এর পরে উমাচরণ মাস্টার যখন পড়াতেন, তখন হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে দেখতাম। একজন কবি বটে! উনি ঠিকই বলেছেন — বড়ো বড়ো লোকেরা প্রথম জীবনে মাস্টারি করে। ওঁর বয়স বেশি হয়েছে বটে কিন্তু উনি একজন কবিও তো হয়েছেন। সারদাটা কিছুই বোঝে না।

বছরখানেক কাটল। আমরা কটি ছেলে উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হয়েছি। সেই বছর উমাচরণ মাস্টার আমাদের নিয়ে রানাঘাটে যাবেন পরীক্ষা দেওয়াতে। চারটি ছেলে — মনে আছে চক্কত্তিদের কানাই, আমি, সতু ও সারদা। দুর্গাপুর থেকে হেঁটে বেরিয়ে শাবলতলার মাঠে যখন পড়েছি, তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে।

বড্ড মনে আছে সেই অপরাহ্নের কথাটি। তখন শাবলতলার মাঠে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মস্ত বড়ো মাঠের এখানে ওখানে কুলগাছ শ্যাওড়া-ডাঁটা আর বনতুলসীর জঙ্গল। ধু ধু করছে মাঠ যেন সমুদ্রের মতো, কূলকিনারা নেই কোনো দিকে। এত বড়ো মাঠ কখনও দেখিনি। দুর্গাপুর থেকে শাবলতলার মাঠ প্রায় দু ক্রোশ আড়াই ক্রোশ

পথ। কাছাকাছি কোনো গ্রাম নেই এ মাঠের কোনো দিকে। একটা সরু মেঠো পথ মাঠের মধ্যে দিয়ে দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। কী একটা ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে দুপুরের রোদে। আমরা সবাই ছেলেমানুষ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। উমাচরণ মাস্টার বললেন — যাও সব গাছতলায় একটু বসে নাও।

আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে বোঁচকা। তার মধ্যে আমাদের বই-দপ্তর আছে, কাপড় গামছা ও কাঁথা আছে। থাকতে হবে নাকি হোটেলে। আমরা বোঁচকা নামিয়ে একটা কুলগাছের তলায় সবাই বসলাম। মাস্টারমশায় বললেন — দেখো তো কুল হয়েছে কিনা।

সতু দেখে বললে — কুল হয়েছে, ছোটো ছোটো — খাওয়া যায় না।

কানাই-এর মা ওকে সেখানে গিয়ে খাবার জন্যে নারকেলের নাড়ু আর রুটি করে দিয়েছিলেন পুঁটুলিতে। সতু ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খেলে। আমি চাইতে গেলাম, কানাই বললে, নেই।

আমরা একটু পরে সবাই বোঁচকা রেখে হুটোপাটি করে মাঠের মধ্যে বনতুলসীর জঙ্গলে খেলা করতে লাগলুম। কী সুন্দর যে লাগছিল। ক্ষুদ্র গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় খেলা করে বেড়াই, এত বড়ো মাঠের এত ফাঁকা জায়গায় খেলা করবার সুযোগ কখনও পাইনি। ওদের কেমন লাগছিল জানি না, আমার মনে হচ্ছিল যেন কোনো নতুন রাজ্যে রূপকথার জগতে এসে পড়েছি — তুলসীমঞ্জরীর সুগন্ধভরা অপরাহ্ণের বাতাসে যেন কোন সুদূরের ইঙ্গিত। যে দেশ কখনও দেখিনি, তার কথা কিন্তু আমার মনে সর্বদাই উঁকি দেয়, আজ এই শাবলতলার মাঠে এসে সেই দূর-দূরান্তকে দেখতে পেলাম। ঝোপে ঝোপে শালিক আর ছাতারে পাখির কলরব, এখানে ওখানে বেলে জমিতে খেঁকশেয়ালের গর্ত, রাঙা কেলেকোঁড়া ফুলের লতা জড়িয়ে উঠেছে বুনো কলুচটকা আর তিত্তিরাজ গাছে, জনমানুষের বাস নেই, একটা কলা গাছ কি আম গাছ চোখে পড়ে না, যেন এ জগতে মানুষের বাস নেই, শুধুই বনঝোপের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ মচ করে পাতার ধুলো উড়িয়ে এ দেশে চলে যাও, লেখাপড়ার বিরক্তিকর বাধ্যতা এখানে নেই। খেলা ছেড়ে লেখাপড়া করতে কেউ বলবে না এ দেশে। উমাচরণ মাস্টার সেই পুরোনো, একঘেয়ে, বালকের পক্ষে মহা বিরক্তিকর জগতের মানুষ, এ নতুন জীবনের উদাস মুক্তির মধ্যে, দিনরাতব্যাপী খেলা আর অবকাশের মধ্যে ওঁর স্থান নেই আদৌ।

বেলা পড়ে এসেছে। হঠাৎ সতু বললে — হ্যাঁরে, মাস্টারমশাই কোথায় রে?

আমি বললাম — কেন, কুলতলায় নেই?

— কতক্ষণ তো তাঁকে দেখছি নে। গেলেন কোথায়? আমাদের যেতে হবে না ইস্টিশনে? দু ঘণ্টার ওপর তো এখানে আছি। গাড়ি ধরতে হবে না?

আমার মনে হচ্ছিল গাড়ি ধরে আর কি রাজা হব আমরা! এই তো বেশ আছি, উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষার বিভীষিকার মধ্যে না-ই বা গেলাম। ইন্‌স্‌পেক্টর এসে সেবার স্কুলে বলে গিয়েছিল রানাঘাটে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ায় নাকি নানা গোলমাল। খাতায় লিখে পরীক্ষা হয়, গার্ড আছে সেখানে ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে, একটু যে দেখাদেখি করবে কী বলাবলি করবে তার কোনো উপায় নেই। বলাবলি করলেই মহকুমার হাকিমের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে, তিনি জেলও দিতে পারেন, জরিমানাও করতে পারেন। একটু ফিসফাস করবার জো নেই সেখানে। নবমীর পাঁটার মতো কাঁপতে কাঁপতে ঢুকতে হবে হলঘরে। কী ভীষণ পরিণাম ছাত্রজীবনের!

সত্যি বলছি, শাবলতলার মাঠ দেখবার পরে, এখানে এসে এই দু ঘণ্টা ছুটোছুটি করে বেড়ানোর পরে

আমি যেন জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি। তা হচ্ছে এই রকম বিশাল মুক্ত বনময় ধূলিভরা মাঠের অবাধ শান্তি আর স্বাধীনতার মধ্যে খেলা করে বেড়ানো। পরীক্ষা দিয়ে কী হবে! কানাই এসেও বললে — আমরা যাব কখন? মাস্টারমশাই কোথায়?

সত্যিই তো, তাঁকে কোনো দিকে দেখা যাচ্ছে না। সবাই মিলে খুঁজতে বার হওয়া গেল। সতু ডাকতে লাগল — ও মাস্টারমশাই, মাস্টার ম-শা-ই—

কোনো সাড়া নেই।

সতু ভীতুমুখে বলল — বাঘে নিয়ে গেল নাকি রে?

কানাই বললে — দূর, এখানে মানুষ-খেকো বাঘ থাকবে?

— না, নেই! তোকে বলেছে!

— তবে গেলেন কোথায়?

আমি বললাম — তোমরা খুঁজে দেখো। আমি এখানে খেলা করি।

এমন সময় সারদা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল — শীগগির — শীগগির আয় — দেখে যা —

আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠেলাম — কী হয়েছে রে? বেঁচে আছেন তো?

কথা বলতে বলতেই আমরা সারদার পেছনে ছুটলাম। বেশ খানিকটা দূর দৌড়ে সারদা থেমে পড়ল এবং আঙুল দিয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে আমাদের চুপ করতে বলে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল।

একটা শুকনো খাল-মতো নীচু জায়গায় কুঁচঝোপের আড়ালে উমাচরণ মাস্টার বসে বসে ঝুঁকে পড়ে লিখতে লিখতে বিড় বিড় করে আপনমনে কী বলছেন, এমন কী আপনমনে ফিক ফিক করে হাসছেনও। যে কেউ দেখলে বলবে উন্মাদ পাগল। অমন তন্ময় হয়ে লিখতে আমরা তাঁকে কখনও দেখিনি, অমন ভাবে আপনমনে হাসতেও তাঁকে কখনও দেখিনি।

সতু মুগ্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে বললেন — মাস্টারমশাই একজন আসল কবি।

সারদা ওর মতে মত দিয়ে বললেন — ঠিক তাই।

কানাই ও আমি কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে এই সত্যিকার জীবন্ত কবিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমাদের কত ভাগ্যি যে আমরা এমন মাস্টার পেয়েছি।

কানাই একটু পরে বললে — কিন্তু ভাই, সন্ধে হলো। ওঁকে না ডাকলে আমাদের উপায় কী হবে? ডাকি ওঁকে! কী বলিস?

কেউ সাহস করে না।

সারদার মনে কবির প্রতি শ্রদ্ধা একটু ফিকে, সে দু-একবার আমাদের উপস্থিতি-জ্ঞাপক কাশির আওয়াজ করলে।

সতু চুপি চুপি বললে — এই! আস্তে!

সারদা বললে — হ্যাঁ, আস্তে বই কী! আমরা মরি এখন এই মাঠের মধ্যে সন্ধেবেলা! বাঘে ধরুক সবসুদ্ধ — বলে সজোরে একবার কাশির আওয়াজ করতেই উমাচরণ মাস্টার চমকে পেছন ফিরে চাইলেন।

সারদা বললে — আসুন মাস্টারমশাই, সন্ধের দেরি নেই যে — ইস্টিশান এখনও অনেকখানি রাস্তা —

উমাচরণ মাস্টার ব্যস্ত হয়ে খাতাপত্র গুটিয়ে বগলে করে নিয়ে আমাদের কাছে উঠে এলেন শুকনো খাল থেকে। অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন — তাই তো, বেলা গিয়েছে দেখছি। চল চল!

তারপর পেছনদিকে চেয়ে বললেন — জায়গাটা বড়ো চমৎকার — না?

সতু সশ্রদ্ধ সুরে বললে — ওখানে কী করছিলেন মাস্টারমশাই? কী আছে ওখানে?

উমাচরণ মাস্টার ধমক দিয়ে বললেন — সে কী তুই বুঝবি? সিনারি কাকে বলে জানিস? চমৎকার সিনারি ওখানটাতে। কবিতা লিখছিলাম। কী চমৎকার মাঠটা, বুঝিস কিছু?

আমারও চোখে যে এই অপরাহ্ণে এই মাঠ অদ্ভুত ভালো লেগেছে, মাস্টারমশায়ের কথার মধ্যে তার সায় পেয়ে আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। আমি নতুন দৃষ্টি পেলাম সেই দিনটিতে, উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দিতে যাবার পথে। উমাচরণ মাস্টার কত বড়ো শিক্ষকের কাজ করলেন সেদিন — তিনি নিজেও কি তা বুঝলেন?

আমার কথা এখানেই শেষ। উমাচরণ মাস্টারের ইতিহাসও এখানেই শেষ। প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগের কথা সেসব। উমাচরণ মাস্টার আজ আর বোধ হয় বেঁচে নেই। বড়ো হয়ে উমাচরণ চক্রবর্তী বলে কোনো কবির লেখা কোথাও পড়িনি বা কারও মুখে নামও শুনিনি। তাতে কিছু আসে যায় না। যশোভাগ্য সকলের কি থাকে!

আজ এতকাল পরে শাবলতলার মাঠে এসে আবার মনে পড়ে গেল বাল্যের সেই অপূর্ব অপরাহ্ণের কথা, মনে পড়ে গেল উমাচরণ মাস্টারকে। দুঃখ হলো দেখে — সে শাবলতলার মাঠ একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মুছে গিয়েছে সে সৌন্দর্য, সে নির্জনতা। উমাচরণ মাস্টারের জন্যে মনটা এতদিন পরে যেন কেমন করে উঠল।

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ — ১৯৫০) :** জন্মস্থান বনগ্রাম, চব্বিশ পরগনা। বাল্য ও কৈশোর দারিদ্র্য, অভাব ও অনটনের মধ্যে কেটেছিল। জীবিকার ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক ও বহুধা বিস্তৃত, শিক্ষাকতাও করেছেন দীর্ঘদিন। পল্লী-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য তাঁকে মুগ্ধ করত। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'উপেক্ষিতা' গল্প দিয়ে তাঁর কথাসাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রচনা 'পথের পাঁচালী' বইটি ভাগলপুরে লেখা। মাত্র একুশ বছরের সাহিত্য-জীবনে তিনি অনেক গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, দিনলিপি এবং শিশু সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে— 'বনে পাহাড়ে', 'মরণের ডঙ্কা বাজে', 'হিরে মানিক জ্বলে', 'চাঁদের পাহাড়', 'আরণ্যক', 'অপরাজিত', 'ইছামতী', 'দেবযান', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'কিন্নরদল' ইত্যাদি। 'উৎকর্ণ', 'স্মৃতির রেখা', 'অভিযাত্রিক' প্রভৃতি হলো তাঁর দিনলিপি জাতীয় রচনা। তাঁর লেখায় পল্লী-প্রকৃতি এবং অরণ্য-প্রান্তর যেমন আশ্চর্য সজীবতা লাভ করেছে তেমনই গ্রামবাংলার দুঃখ, দারিদ্র্য, স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁর লেখায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৫১ সালে তাঁকে মরণোত্তর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

# তিনপাহাড়ের কোলে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকারে তিনপাহাড়ে ট্রেনের থেকে নেমে,
হাওয়াবিলাসী তিনজোড়া চোখ আটকে গেল ফ্রেমে।
জনমানববিহীন স্টেশন, আকাশ ভরা তারায়,
এমন একটি দেশে আসলে সক্কলে পথ হারায়।

পথ হারিয়ে যায় যেদিকে, সেদিকে পথ আছেই,
ঝরনা, কাঁদড়, টিলা, পাথর বনভূমির কাছেই।
বনভূমির ওপারে কোন মনোভূমির দ'য়,
ফুসুর ফাসুর ঘুসুর ঘাসুর স্বপ্নে কথা হয় !

পুব আকাশে আস্তে-ধীরে আলোর ঘোমটা খোলে,
শক্ত সবুজ গাঁ ভেসেছে তিনপাহাড়ের কোলে।
সহজ করে বাঁচা কি আর খাঁচাতে সম্ভব?
তিনপাহাড়ের নক্‌শিকাঁথায় শিশুর কলবর।

**শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩—১৯৯৫) :** বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি। জন্ম দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহড়ু গ্রামে। পড়াশুনো করেছেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে অধ্যয়ন অসমাপ্ত। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় 'যম' কবিতা লিখে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য'। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫১। প্রণীত-অনূদিত-সম্পাদিত কবিতা ও গদ্যগ্রন্থের সংখ্যা ১১১। এগুলির মধ্যে 'ধর্মে আছি জিরাফেও আছি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। 'কুয়োতলা', 'অবনী বাড়ি আছো?' তাঁর লেখা বিখ্যাত দুটি উপন্যাস। তিনি 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'কবিতা সাপ্তাহিকী' প্রকাশ করে কাব্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। 'অতিথি অধ্যাপক' হিসেবে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনায় রত থাকাকালীন আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। তিনি 'আনন্দ পুরস্কার', 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার পেয়েছেন।

# জ্ঞানচক্ষু

## আশাপূর্ণা দেবী

কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল!

নতুন মেসোমশাই, মানে যাঁর সঙ্গে এই কদিন আগে তপনের ছোটোমাসির বিয়ে হয়ে গেল দেদার ঘটাপটা করে, সেই তিনি নাকি বই লেখেন। সে সব বই নাকি ছাপাও হয়। অনেক বই ছাপা হয়েছে মেসোর।

তার মানে—তপনের নতুন মেসোমশাই একজন লেখক। সত্যিকার লেখক।

জলজ্যান্ত একজন লেখককে এত কাছ থেকে কখনো দেখেনি তপন, দেখা যায়, তাই জানতো না। লেখকরা যে তপনের বাবা, ছোটোমামা বা মেজোকাকুর মতো মানুষ, এবিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের।

কিন্তু নতুন মেসোকে দেখে জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল তপনের।

আশ্চর্য, কোথাও কিছু উলটোপালটা নেই, অন্য রকম নেই, একেবারে নিছক মানুষ! সেই ওঁদের মতোই দাড়ি কামান, সিগারেট খান, খেতে বসেই 'আরে ব্যস, এত কখনো খাওয়া যায়?' বলে অর্ধেক তুলিয়ে দেন, চানের সময় চান করেন এবং ঘুমের সময় ঘুমোন।

তাছাড়া—

ঠিক ছোটো মামাদের মতোই খবরের কাগজের সব কথা নিয়ে প্রবলভাবে গল্প করেন, তর্ক করেন, আর শেষ পর্যন্ত 'এ দেশের কিছু হবে না' বলে সিনেমা দেখতে চলে যান, কী বেড়াতে বেরোন সেজেগুজে।

মামার বাড়িতে এই বিয়ে উপলক্ষ্যেই এসেছে তপন, আর ছুটি আছে বলেই রয়ে গেছে। ওদিকে মেসোরও না কী গরমের ছুটি চলছে। তাই মেসো শ্বশুরবাড়িতে এসে রয়েছেন কদিন।

তাই অহরহই জলজ্যান্ত একজন লেখককে দেখবার সুযোগ হবেই তপনের। আর সেই সুযোগেই দেখতে পাচ্ছে তপন, 'লেখক' মানে কোনো আকাশ থেকে পড়া জীব নয়, তপনদের মতোই মানুষ।

তবে তপনেরই বা লেখক হতে বাধা কী?

মেসোমশাই কলেজের প্রফেসার, এখন ছুটি চলছে তাই সেই সুযোগে শ্বশুরবাড়িতেই রয়ে গেছেন কদিন। আর সেই সুযোগেই দিব্যি একখানি দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। ছোটোমাসি সেই দিকে ধাবিত হয়।

তপন অবশ্য 'না আ-আ-' করে প্রবল আপত্তি তোলে, কিন্তু কে শোনে তার কথা?

ততক্ষণে তো গল্প ছোটোমেসোর হাতে চলেই গেছে। হইচই করে দিয়ে দিয়েছে ছোটোমাসি তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে।

তপন অবশ্য মাসির এই হইচইতে মনে মনে পুলকিত হয়।

মুখে আঁ আঁ করলেও হয়।

কারণ লেখার প্রকৃত মূল্য বুঝলে নতুন মেসোই বুঝবে। রত্নের মূল্য জহুরির কাছেই।

একটু পরেই ছোটোমেসো ডেকে পাঠান তপনকে এবং বোধকরি নতুন বিয়ের শ্বশুরবাড়ির ছেলেকে খুশি করতেই বলে ওঠেন, 'তপন, তোমার গল্প তো দিব্যি হয়েছে। একটু 'কারেকশান' করে ইয়ে করে দিলে ছাপতে দেওয়া চলে।'

তপন প্রথমটা ভাবে ঠাট্টা, কিন্তু যখন দেখে মেসোর মুখে করুণার ছাপ, তখন আহ্লাদে কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়।

'তা হলে বাপু তুমি ওর গল্পটা ছাপিয়ে দিও—মাসি বলে, 'মেসোর উপযুক্ত কাজ হবে সেটা।'

মেসো তেমনি করুণার মূর্তিতে বলেন, 'তা দেওয়া যায়! আমি বললে 'সন্ধ্যাতারার' সম্পাদক 'না' করতে পারবে না। ঠিক আছে; তপন, তোমার গল্প আমি ছাপিয়ে দেবো।'

বিকেলে চায়ের টেবিলে ওঠে কথাটা।

আর সবাই তপনের গল্প শুনে হাসে। কিন্তু মেসো বলেন, 'না -না আমি বলছি—তপনের হাত আছে। চোখও আছে। নচেৎ এই বয়সের ছেলেমেয়েরা গল্প লিখতে গেলেই তো—হয় রাজারানির গল্প লেখে, নয় তো—খুন জখম অ্যাকসিডেন্ট, অথবা না খেতে পেয়ে মরে যাওয়া, এইসব মালমশলা নিয়ে বসে। তপন যে সেই দিকে যায়নি, শুধু ওর ভরতি হওয়ার দিনের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির বিষয় নিয়ে লিখেছে, এটা খুব ভালো। ওর হবে।'

তপন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায়।

তারপর ছুটি ফুরোলে মেসো গল্পটি নিয়ে চলে গেলেন। তপন কৃতার্থ হয়ে বসে বসে দিন গোনে।

এই কথাটাই ভাবছে তপন রাত-দিন। ছেলেবেলা থেকেই তো রাশি রাশি গল্প শুনেছে তপন আর এখন বস্তা বস্তা পড়ছে, কাজেই গল্প জিনিসটা যে কী সেটা জানতে তো বাকি নেই?

শুধু এইটাই জানা ছিল না, সেটা এমনই সহজ মানুষেই লিখতে পারে। নতুন মেসোকে দেখে জানল সেটা।

তবে আর পায় কে তপনকে?

দুপুরবেলা, সবাই যখন নিথর নিথর, তখন তপন আস্তে একটি খাতা (হোম টাস্কের খাতা আর কী! বিয়ে বাড়িতেও যেটি মা না আনিয়ে ছাড়েননি।) আর কলমটি নিয়ে তিনতলার সিঁড়িতে উঠে গেল, আর তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, একাসনে বসে লিখেও ফেলল আস্ত একটা গল্প।

লেখার পর যখন পড়ল, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তপনের, মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

একী ব্যাপার!

এ যে সত্যিই হুবহু গল্পের মতোই লাগছে! তার মানে সত্যিই একটা গল্প লিখে ফেলেছে তপন। তার মানে তপনকে এখন 'লেখক' বলা চলে।

হঠাৎ ভয়ানক একটা উত্তেজনা অনুভব করে তপন, আর দুদ্দাড়িয়ে নীচে নেমে এসে—ছোটোমাসিকেই বলে বসে, 'ছোটোমাসি, একটা গল্প লিখেছি।'

ছোটোমাসিই ওর চিরকালের বন্ধু, বয়সে বছর আষ্টেকের বড়ো হলেও সমবয়সি, কাজেই মামার বাড়ি এলে সব কিছুই ছোটোমাসির কাছে। তাই এই ভয়ানক আনন্দের খবরটা ছোটোমাসিকে সর্বাগ্রে দিয়ে বসে।

তবে বিয়ে হয়ে ছোটোমাসি যেন একটু মুরুব্বি মুরুব্বি হয়ে গেছে, তাই গল্পটা সবটা না পড়েই একটু চোখ বুলিয়েই বেশ পিঠ চাপড়ানো সুরে বলে, 'ওমা এ তো বেশ লিখেছিস রে? কোনোখান থেকে টুকলিফাই করিসনি তো?

'আঃ ছোটোমাসি, ভালো হবে না বলছি।'

'আরে বাবা খেপছিস কেন? জিজ্ঞেস করছি বই তো নয়! রোস তোর মেসোমশাইকে দেখাই—।'

কিন্তু গেলেন তো—গেলেনই যে।

কোথায় গল্পের সেই আঁটসাঁট ছাপার অক্ষরে গাঁথা চেহারাটি? যার জন্যে হাঁ করে আছে তপন? মামার বাড়ি থেকে বাড়িতে চলে এসেও।

এদিকে বাড়িতে তপনের নাম হয়ে গেছে, কবি, সাহিত্যিক, কথাশিল্পী। আর উঠতে বসতে ঠাট্টা করছে 'তোর হবে। হাঁ বাবা তোর হবে।'

তবু এইসব ঠাট্টা-তামাশার মধ্যেই তপন আরো দু'তিনটে গল্প লিখে ফেলেছে। ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, হোম টাস্ক হয়ে ওঠেনি, তবু লিখছে। লুকিয়ে লিখছে। যেন নেশায় পেয়েছে।

তারপর ছুটি ফুরোল, রীতিমতো পড়া শুরু হয়েছে। প্রথম গল্পটি সম্পর্কে একেবারে আশা ছাড়া হয়ে গেছে, বিষণ্ণ মন নিয়ে বসে আছে এমন সময় ঘটল সেই ঘটনা।

ছোটোমাসি আর মেসো একদিন বেড়াতে এল, হাতে এক সংখ্যা 'সন্ধ্যাতারা'।

কেন? হেতু? 'সন্ধ্যাতারা' নিয়ে কেন?

বুকের রক্ত ছলকে ওঠে তপনের।

তবে কী? সত্যিই তাই? সত্যিই তপনের জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনটি এল আজ?

কিন্তু তাই কী সম্ভব? সত্যিকার ছাপার অক্ষরে তপন কুমার রায়ের লেখা গল্প, হাজার-হাজার ছেলের হাতে হাতে ঘুরবে?

পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?

তা ঘটেছে, সত্যিই ঘটেছে।

সূচিপত্রেও নাম রয়েছে।

'প্রথম দিন' (গল্প) শ্রীতপন কুমার রায়।

সারা বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায়, তপনের লেখা গল্প পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ওর লেখক মেসো ছাপিয়ে দিয়েছে! পত্রিকাটি সকলের হাতে হাতে ঘোরে, সকলেই একবার করে চোখ বোলায় আর বলে, 'বারে, চমৎকার লিখেছে তো।'

মেসো অবশ্য মৃদু মৃদু হাসেন, বলেন, 'একট-আধটু 'কারেকশান' করতে হয়েছে অবশ্য। নেহাত কাঁচা তো?'

মাসি বলে, 'তা হোক, নতুন নতুন অমন হয়—'

ক্রমশ ও কথাটাও ছড়িয়ে পড়ে।

ওই কারেকশানের কথা।

বাবা বলেন, 'তাই। তা নইলে ফট করে একটা লিখল, আর ছাপা হলো,—'

মেজোকাকু বলেন, 'তা ওরকম একটি লেখক মেসো থাকা মন্দ নয়। আমাদের থাকলে আমরাও চেষ্টা করে দেখতাম।'

ছোটোমাসি আত্মপ্রসাদের প্রসন্নতা নিয়ে বসে বসে ডিম ভাজা আর চা খায়, মেসো শুধু কফি।

আজ আর অন্য কথা নেই, শুধু তপনের গল্পের কথা, আর তপনের নতুন মেসোর মহত্ত্বের কথা। উনি নিজে গিয়ে না দিলে কি আর 'সন্ধ্যাতারা'-র সম্পাদক তপনের গল্প কড়ে আঙুল দিয়ে ছুঁতো?

তপন যেন কোথায় হারিয়ে যায় এইসব কথার মধ্যে। গল্প ছাপা হলে যে ভয়ংকর আহ্লাদটা হবার কথা, সে আহ্লাদ খুঁজে পায় না।

অনেকক্ষণ পরে মা বলেন, 'কই তুই নিজের মুখে একবার পড় তো তপন শুনি! বাবা, তোর পেটে পেটে এত!'

এতক্ষণে বইটা নিজের হাতে পায় তপন।

মা বলেন, 'কই পড়? লজ্জা কী? পড়, সবাই শুনি।'

তপন লজ্জা ভেঙে পড়তে যায়।

কেশে গলা পরিষ্কার করে।

কিন্তু এ কী!

এসব কী পড়ছে তপন?

এ কার লেখা?

এর প্রত্যেকটি লাইন তো নতুন আনকোরা, তপনের অপরিচিত।

এর মধ্যে তপন কোথা?

তার মানে মেসো তপনের গল্পটিকে আগাগোড়াই কারেকশান করেছেন। অর্থাৎ নতুন করে লিখেছেন, নিজের পাকা হাতে কলমে! তপন আর পড়তে পারে না। বোবার মতো বসে থাকে। তারপর ধমক খায়, 'কীরে তোর যে দেখি পায়া ভারী হয়ে গেল। সবাই শুনতে চাইছে তবু পড়ছিস না? না কি অতি আহ্লাদে বাক্য হরে গেল?'

তপন গড়গড়িয়ে পড়ে যায়। তপনের মাথায় ঢোকে না—সে কী পড়ছে। তবু 'ধন্যি ধন্যি' পড়ে যায়। আর একবার রব ওঠে তপনের লেখক মেসো তপনের গল্পটি ছাপিয়ে দিয়েছে।

তপন বইটা ফেলে রেখে চলে যায়, তপন ছাতে উঠে গিয়ে শার্টের তলাটা তুলে চোখ মোছে। তপনের মনে হয় আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন। কেন? তা জানে না তপন।

শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন, যদি কখনো লেখা ছাপতে দেয় তো, তপন নিজে গিয়ে দেবে। নিজের কাঁচা লেখা। ছাপা হয় হোক, না হয় না হোক।

তপনকে যেন আর কখনো শুনতে না হয় 'অমুক তপনের লেখা ছাপিয়ে দিয়েছে।'

আর তপনকে যেন নিজের গল্প পড়তে বসে অন্যের লেখা লাইন পড়তে না হয়।

তার চেয়ে দুঃখের কিছু নেই, তার থেকে অপমানের!

**আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯—১৯৯৫) :** অন্যতম প্রধান বাঙালি লেখিকা। জন্ম কলকাতায়। স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ ঘটেনি। অথচ অসামান্য সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সংবেদনশীলতা ও পরিচিত সমাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনকে আশ্চর্য দক্ষতায় তার গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য উপন্যাস, গল্প এবং ছোটোদের জন্য অজস্র বই লিখেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — 'ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা', 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'সাগর শুকায়ে যায়', 'শশীবাবুর সংসার', 'সোনার হরিণ' ইত্যাদি। তাঁর রচিত অন্তত ৬৩টি গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার', 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার', 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার', একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি. লিট' এবং নানা সরকারি খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

# বুধুয়ার পাখি

## অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জানো এটা কার বাড়ি? শহুরে বাবুরা ছিল কাল,
ভীষণ শ্যাওলা এসে আজ তার জানালা দেয়াল
ঢেকে গেছে, যেন ওর ভয়ানক বেড়ে গেছে দেনা,
তাই কোনো পাখিও বসে না।
এর চেয়ে আমাদের কুঁড়েঘর ঢের ভালো, ঢের
দলে-দলে নীল পাখি নিকোনো নরম উঠোনের
ধান খায়, ধান খেয়ে যাবে...
বুধুয়া অবাক হয়ে ভাবে।

এবার রিখিয়া ছেড়ে বাবুডির মাঠে
বুধুয়া অবাক হয়ে হাঁটে,
দেহাতি পথের নাম ভুলে
হঠাৎ পাহাড়ে উঠে পাহাড়ের মতো মুখ তুলে
ভাবে : ওটা কার বাড়ি, কার অত নীল,
আমার ঘরের চেয়ে আরো ভালো, আরো
নিকোনো উঠোন তার, পাখিবসা বিরাট পাঁচিল।
ওখানে আমিও যাব, কে আমায় নিয়ে যেতে পারো?

এইভাবে প্রতিদিন বুধুয়ার ডাকে
কানায় কানায় আলো পথের কলশে ভরা থাকে,
ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি আসে, কেউ তার দিদি, কেউ মাসি,
রুপোলি ডানায় যারা নিয়ে যায় বুধুয়ার হাসি॥

**অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩) :** জন্ম কলকাতায়। পড়াশুনো করেছেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। একালের বিখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পরে জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ইংরেজি ও জার্মান ভাষাতেও তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— 'যৌবন বাউল', 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', 'রক্তাক্ত ঝরোখা', 'গিলোটিনে আলপনা', 'জ্বরের ঘোরে তরাজু কেঁপে যায়', 'এক একটি উপভাষায় বৃষ্টি পড়ে' ইত্যাদি। 'ধুলো মাখা ঈথারের জামা' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং 'মরমী করাত' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার পান। বহু প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন গ্যোয়টে, ব্রেশট সহ বহু জার্মান কবির কবিতা ও নাটক। জার্মানির 'গ্যোয়টে পুরস্কার', 'আনন্দ পুরস্কার' ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সুধা বসু পুরস্কার' পেয়েছেন।

# অসুখী একজন

## পাবলো নেরুদা

আমি তাকে ছেড়ে দিলাম
অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রেখে দরজায়
আমি চলে গেলাম দূর... দূরে।

সে জানত না আমি আর কখনো ফিরে আসব না।

একটা কুকুর চলে গেল, হেঁটে গেল গির্জার এক নান
একটা সপ্তাহ আর একটা বছর কেটে গেল।

বৃষ্টিতে ধুয়ে দিল আমার পায়ের দাগ
ঘাস জন্মালো রাস্তায়

আর একটার পর একটা, পাথরের মতো
পর পর পাথরের মতো, বছরগুলো
নেমে এল তার মাথার ওপর।

তারপর যুদ্ধ এল
রক্তের এক আগ্নেয়পাহাড়ের মতো।
শিশু আর বাড়িরা খুন হলো।
সেই মেয়েটির মৃত্যু হলো না।

সমস্ত সমতলে ধরে গেল আগুন
শান্ত হলুদ দেবতারা
যারা হাজার বছর ধরে
ডুবে ছিল ধ্যানে
উল্টে পড়ল মন্দির থেকে টুকরো টুকরো হয়ে
তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।
সেই মিষ্টি বাড়ি, সেই বারান্দা
যেখানে আমি ঝুলন্ত বিছানায় ঘুমিয়েছিলাম,
গোলাপি গাছ, ছড়ানো করতলের মতো পাতা
চিমনি, প্রাচীন জলতরঙ্গ
সব চূর্ণ হয়ে গেল, জ্বলে গেল আগুনে।

যেখানে ছিল শহর
সেখানে ছড়িয়ে রইল কাঠকয়লা
দোমড়ানো লোহা, মৃত পাথরের মূর্তির বীভৎস
মাথা
রক্তের একটা কালো দাগ।

আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায়।

**তরজমা :** নবারুণ ভট্টাচার্য

**পাবলো নেরুদা (১৯০৪—১৯৭৩) :** প্রখ্যাত কবি, কূটনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ পাবলো নেরুদা চিলির সীমান্ত শহর পারলেতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নেকতালি রিকার্দো রেয়েস্স বাসোয়ালতো। 'পাবলো নেরুদা' নামটির উৎস চেক লেখক জাঁ নেরুদা এবং পাবলো নামটির সম্ভাব্য উৎস পাবলো পিকাসো। মানুষের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে তিনি যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনই লিখেছেন ঐতিহাসিক মহাকাব্য, প্রকাশ্য রাজনৈতিক ইস্তাহার। ১৯২৭ সালে চিলির সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদূত করে রেঙ্গুনে পাঠায়। এ পদে থেকে তিনি চিন, জাপান, কলম্বোসহ ভারতেও আসেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। চিলিতে অগাস্তো পিনোচেতের নেতৃত্বাধীন সামরিক অভ্যুত্থানের সময় ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হন নেরুদা। তিনদিন পরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে— 'কুড়িটা প্রেমের কবিতা এবং একটি হতাশার গান', 'এ পৃথিবীর আবাসভূমি', 'প্রাণের স্পেন', 'বিশ্বসংগীত', 'চিলির পাথর', 'হোয়াকিন মুরিয়েতার গরিমা ও মৃত্যু', 'ক্যাপ্টেনের কবিতা', 'শীতের বাগিচা' ইত্যাদি।

# আমাকে দেখুন

## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। এই যে আমি এখানে। একটু আগে আমি বাসের পা-দানিতে ঠেলে-ঠুলে উঠলাম, তারপর নীরেট জমাট ভিড়ের ভিতরে আমি এ-বগল সে-বগলের তলা দিয়ে, এর ওর পায়ের ফোঁকর দিয়ে ঠিক ইঁদুরের মতো একটা গর্ত কেটে কেটে এতদূর চলে এসেছি। বাসের রডগুলো বড়ো উঁচুতে—আমি বেঁটে মানুষ—অতদূর নাগাল পাই না। আমি সিটের পিছন দিক ধরে দাঁড়াই, তারপর গা ছেড়ে দিই! বাসের ঝাঁকুনিতে যখন আমি দোল খাই আশেপাশের মানুষের গায়ে ভর দিয়ে টাল সামলাই, তখন আমার আশেপাশের লোক কেউ খুব একটা রাগ করে না। কারণ আমার ওজন এত কম যে, কারও গায়ে ঢলে পড়লেও সে আমার ভার বা ধাক্কা টেরই পায় না। হ্যাঁ, এখন আমি বাসের পিছন দিকটায় একটা সিট চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দু-ধারে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু সব মানুষ। তারা আমাকে এত ঢেকে আছে যে, বোধহয় আমাকে দেখাই যাচ্ছে না। কিংবা দেখলেও লক্ষ করছে না কেউ। ওইটাই মুশকিল। আমাকে অনেকেই দেখে, কিন্তু লক্ষ করে না। এখন আমি যার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা যার মুখোমুখি, তারা আমাকে হয়তো দেখছে, কিন্তু

নির্লিপ্তভাবে। যেন আমি না থাকলেও কোনো ক্ষতি বা লাভ ছিল না। তার কারণ বোধহয় এই যে, আমার চেহারায় এমন কিছু নেই, যাতে আমাকে আলাদা করে চেনা যায়। হ্যাঁ মশাই আমি মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, রোগাই, তবে খুব রোগা নয় যেটা চোখে লাগে, কালোই তবে খুব কালো নয় যে, আর একবার তাকিয়ে দেখবে কেউ। চল্লিশ বছরের পর আমার মাথা ক্রমে ফাঁকা হয়ে চুল পাতলা হয়ে এসেছে অথচ টাকও পড়েনি—টেকোমানুষকেও কেউ কেউ দেখে। তার ওপর আমার মুখখানা—সেটা না খুব কুচ্ছিত না সুন্দর—আমার নাক থ্যাবড়া নয় চোখাও নয়, চোখ বড়োও নয় আবার কুতকুতেও নয়। কাজেই এই যে এখন ভিড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি—দু-ধারে উঁচু উঁচু মানুষ—এই ভিড়ের মধ্যে কেউ কি আমাকে দেখছেন? দেখছেন না। কিংবা দেখলেও লক্ষ করছেন না—আমি জানি।

আমার বিয়ের পর একটা খুব মর্মান্তিক মজার ঘটনা ঘটেছিল। বউভাতের দুই একদিন পর আমি আমার বউকে নিয়ে একটু বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। আর কয়েকদিন পরই দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি যাব, সেই কারণেই কিছু নমস্কারি কাপড়-চোপড় কেনা দরকার ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে আমি আমার বউকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিউ মার্কেটে যাবে?' আমার যা অবস্থা তাতে নিউ মার্কেটে বাজার করার কোনো অর্থ হয় না, বরাবর আমার বাসার কাছে কাটরায় সস্তায় কাপড়-চোপড় কিনি। তবু যে আমি এই কথা বলেছিলাম, তার এক নম্বর কারণ ছিল যে, আমার বউটি ছিল মফস্‌সলের মেয়ে, নিউ মার্কেট দেখেনি, আর দুই নম্বর কারণ হলো আমার শ্বশুরবাড়ির দিকটা আমাদের তুলনায় বেশ একটু পয়সাওয়ালা। আমি নিউ মার্কেটের কথা বললাম যাতে আমার নতুন বউটি খুশি হবে, আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন শুনবে, কাপড়-চোপড় নিউ মার্কেট থেকে কেনা, তখন তাদের ভূ একটু ঊর্ধ্বগামী হবে। কিন্তু ওই নিউ মার্কেটের প্রস্তাবটাই একটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। কারণ ওখানে না গেলে ঘটনাটা বোধহয় ঘটতই না। ব্যাপারটা হয়েছিল কী নিউ মার্কেটে ঢোকার পর ঝলমলে দোকান-পসার দেখে আমার বউ মুগ্ধ হয়ে গেল। যে-কোনো দোকানের সামনেই দাঁড়ায়, তারপর শো-কেসে রেখে এক-পা এক-পা করে হাঁটে! আমার দিকে তাকাতেও ভুলে গেল। তখন আমার নতুন বউ, কাজেই আমার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। আমি তাকে এটা ওটা দেখিয়ে একটু মাতব্বরির চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সে বিশেষ কোনো জিনিসের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সব কিছুই দেখতে লাগল। অভিমানটা একটু প্রবল হতেই এক সময়ে আমি ইচ্ছে করেই হাঁটার গতি খুব কমিয়ে দিলাম, কিন্তু বউ সেটা লক্ষ না করে নিজের মনে হেঁটে যেতে লাগল। তাই দেখে এক সময়ে আমি একদম থেমে গেলাম। কিন্তু বউ হাঁটতে লাগল। দোকান-পসারের দিকে তার বিহ্বল চোখ, আর গার্ড অফ অনার দেওয়ার সময়ে সোলজাররা যেমন হাঁটে তেমনি তার হাঁটার ভঙ্গি। আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম আমার বউ সেই ঝলমলে আলোর মধ্যে লোকজনের ভিড় ঠেলে হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে কথাও বলেছিল বটে, আমি তার সঙ্গেই আছি ভেবে, কিন্তু সত্যিই আছি কিনা তা সে লক্ষ করল না। এইভাবে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সে কী একটা জিনিস দেখে খুব উত্তেজিতভাবে আমাকে দেখানোর জন্য মুখ ফিরিয়ে আমাকে খুঁজতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে চেয়ে আকুল হয়ে খুঁজতে লাগল আমাকে। তখনই মজা করার একটা লোভ আমি আর সামলাতে পারলাম না। নিউ মার্কেটে যে গোলকধাঁধার মতো গলিগুলো আছে তার মধ্যে যেটা আমার সামনে ছিল আমি তার মধ্যে ঢুকে গেলাম। এবার মফস্‌সলের মেয়েটা খুঁজুক আমাকে। যেমন সে আমাকে লক্ষ করছিল না, তেমন বুঝুক মজা। আমি আপনমনে হাসলাম, আমি উঁকি মেরে

দেখলাম আমার বউটা কান্নামুখে চারিদিকে চাইতে চাইতে ফিরে আসছে দ্রুত পায়ে। আমার কষ্ট একটু হলো ওর মুখ দেখে, তবু আর একটু খেলিয়ে ধরা দেবো বলে আমি গলির মধ্যে ঢুকে গেলাম। আর ও দিশেহারার মতো এদিক-ওদিক অনেকবার হাঁটল, এ গলি সে গলিতে খুঁজতে লাগল আমাকে। আমি ওকে চোখে-চোখেই রাখছিলাম। এক সময়ে বুঝতে পারলাম যে, এবার আমাকে না পেলে ও কেঁদেই ফেলবে— এমন করুণ হয়ে গেছে ওর মুখশ্রী! চোখ দুটোও ছলছলে আর লাল হয়ে গিয়েছিল। তাই একসময় ও যে গলিটাতে হেঁটে যাচ্ছিল, আমি পা চালিয়ে অন্য পথে গিয়ে সে গলিটার উলটোদিক দিয়ে ঢুকলাম। তারপর হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম! বিপরীত দিক থেকে ও হেঁটে এল, ঠিক মুখোমুখি দেখা হলো আমাদের, এমন কী ও আমার এক ফুট দূরত্বের ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল তবু আমাকে চিনতে পারল না। খুব অবাক হলাম আমি—ও কি আমাকে দেখেনি। আবার আমি অন্যপথে তাড়াতাড়ি গিয়ে অন্য এক গলিতে একটা কাচের বাসনের দোকানের সামনে কড়া আলোয় দাঁড়ালাম। ঠিক তেমনি ও উলটোদিক থেকে হেঁটে এল, চারদিকের লোকজন লক্ষ করল, আমার চোখে ওর চোখ পড়ল, কিন্তু আবার আমাকে পেরিয়ে গেল ও, এমনকি পেরিয়ে গিয়ে একবার পিছু ফিরেও দেখল না। এরকম কয়েকবার আমাদের দেখা হলো—কখনও বইয়ের দোকানের সামনে কখনও ফলের দোকান কিংবা পুতুলের দোকানের সারিতে। কিন্তু ও আমাকে কোনো বারই চিনতে পারল না। উদ্‌ভ্রান্তভাবে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমাকেই পেরিয়ে গেল। তখন আমি ভাবলাম মফস্‌সলের এই মেয়েটা খুব ঘড়েল, আমি ইচ্ছে করে লুকিয়ে ছিলাম বুঝতে পেরে এখন ইচ্ছে করেই চিনতে চাইছে না। কিন্তু ওর মুখের করুণ এবং ক্রমে করুণতর অবস্থা দেখে সে কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছিল না। তবু আমি অবশেষে একটা ঘড়ির দোকানের সামনে ওর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম—এই যে! ও ভীষণ চমকে গিয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখল। বেশ কিছুক্ষণ দেখে-টেখে তারপর ভীষণ জোরে শ্বাস পেলে কেঁপে কেঁপে এসে বলল—তুমি! তুমি! কোথায় ছিলে তুমি! আমি কতক্ষণ তোমাকে খুঁজছি! আশ্চর্য এই যে, তখন আমার মনে হলো ও সত্যি কথাই বলছে। বাসায় ফেরার সময় ওকে আমি বললাম যে, ওর সঙ্গে ওই লুকোচুরি খেলার সময়ে আমি বারবার ওকে ধরার সুযোগ দিয়েছি, ওর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ও প্রথমটায় বিশ্বাস করল না, কিন্তু আমি বারবার বলাতে ও খুব অবাক হয়ে বলল—সত্যি! তাহলে তুমি আর কখনো লুকিও না। এরকম করাটা বিপজ্জনক।

বেঁধে ভাই কনডাক্টর, এইখানেই আমি নেবে যাব—দেখি দাদা...দেখবেন ভাই আমার চশমাটা সামলে...ওই দেখুন, কেউ আমার কথা শুনল না। আমি নামার আগেই কনডাক্টর বাস ছাড়ার ঘণ্টি দিয়ে দিল, গেট আটকে ধুমসো মতো লোকটা অনড় হয়েই রইল আর হাওয়াই শার্ট পরা ছোকরাটা কনুইয়ের গুঁতোয় চশামাটা দিলে বেঁকিয়ে। তাই বলেছিলাম যে, কেউই আমাকে লক্ষ করে না, বাসে-ট্রামে না, রাস্তায় ঘাটে না।

আজকের দিনটা বেশ ভালোই। ফুরফুরে হাওয়া আর রোদ দিয়ে মাখামাখি একটা আদুরে আদুরে গা-ঘেঁষা দিন। শরৎকাল বলে গরমটা খুবই নিস্তেজ। এখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে আমার বেশ ভালোই লাগছে। ওই তো একটু দূরেই একটা ক্রসিং আর তার পরেই আমার অফিস। এই দেখো আমি ক্রসিংটার কাছে এসে রাস্তা পেরোবার জন্য পা বাড়াতেই ট্রাফিক পুলিশ হাত নামিয়ে নিল, আমার পার হওয়ার রাস্তাটা আটকে এখন চলন্ত গাড়ি আর গাড়ি। কেন ভাই ট্রাফিক পুলিশ, আমি যে রাস্তা পেরোচ্ছি তা কি দেখতে পাওনি? আর একটু হাতখানা তুলে রাখলে কি ভেঙে যেত?

যে লিফটে দাঁড়িয়ে আমি দোতলায় উঠছি এই লিফটটা বোধহয় একশো বছরের পুরোনো। এর চারদিকে কালো লোহার গ্রিল—ঠিক একখানা খোলামেলা খাঁচার মতো, মাঝে মাঝে একটু কাঁপে, আর খুব ধীরে ধীরে ওঠে। গত তেরো বছর ধরে আমি এই লিফট বেয়ে উঠছি, এই তেরো বছর ধরে আমাকে সপ্তাহে ছ-দিন লিফটম্যান রামস্বরূপ আভোগী ওপরে তুলছে। কী বলো ভাই রামস্বরূপ, তুমি তো আমাকে বেশ ছোটোটিই দেখেছিলে—যখন আমার বয়স চব্বিশ কী সাতাশ, যখন আমার ভালো করে বুড়োটে ছাপ পড়েনি মুখে। এখন বলো তো আমার নামটা কী! যদি সত্যিই জিজ্ঞেস করি তাহলে এক্ষুনি রামস্বরূপ হা হা করে হেসে উঠে বলবে—আরে জরুর, আপনি তো অরবিন্দবাবু। কিন্তু মোটেই তা নয়। কোনোকালেই আমি অরবিন্দ ছিলাম না। আমি চিরকাল—সেই ছেলেবেলা থেকেই অরিন্দম বসু।

আমার চাকরি ব্যাংকে। দোতলায় আমার অফিস। আগে আমি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ছিলাম, গত দশ বছর ধরে আমি বসছি ক্যাশ-এ। আমি খুব চটপট টাকা গুনতে পারি, হিসেবেও আমি খুব পাকা। তাই ক্যাশ থেকে আমাকে অন্য কোথাও দেওয়া হয় না। হলেও আবার ফিরিয়ে আনা হয়। দশ বছর ধরে আমি খুবই দক্ষতার সঙ্গে ক্যাশের কাজ করছি। কখনও পেমেন্ট, কখনও রিসিভিঙে। পেমেন্টেই বেশি, কারণ ওখানেই সবচেয়ে সতর্ক লোকের দরকার হয়। একটা তারের খাঁচার মধ্যে আমি বসি, আমার বুকের কাছে থাকে অনেক খোপওলা একটা ড্রয়ার। তার কোনটায় কত টাকার নোট তার কোনটায় কোন খুচরো পয়সা রয়েছে, তা আমি নির্ভুলভাবে চোখ বুজে বলে দিতে পারি। পেমেন্টের সময়ে আমি ড্রয়ার খুলে গুনে টাকা বের করি, তারপর ড্রয়ার বন্ধ করি, তারপর আবার গুনি, আবার...তারপর টাকা দিয়ে পরের পেমেন্টের জন্য হাত বাড়াই, টোকেন নিয়ে আবার ড্রয়ার খুলি, টাকা বের করে গুনে...তারপর একইভাবে চলতে থাকে। সামনের ঘুলঘুলিটা দিয়ে যারা আমাকে দেখে তাদের সম্ভবত খুবই ক্লান্তিকর লাগে আমার ব্যবহার—ইস লোকটা কী একঘেয়েভাবে কাজ করেছ—কী একঘেয়ে! ঘুলঘুলি দিয়ে তারা আমাকে দেখে, কিন্তু মনে রাখে না। রামবাবু আমাদের পুরোনো বড়ো খদ্দের—প্রকাণ্ড কারখানা আছে, এজেন্টও তাকে খাতির করে। খুব খুঁতখুঁতে লোক, বেশির ভাগ সময়েই লোক না পাঠিয়ে নিজেই এসে চেক ভাঙিয়ে নিয়ে যান। আমি কতবার তাঁকে পেমেন্ট দিয়েছি, তিনি ঘুলঘুলি দিয়ে প্রসন্ন হাসিমুখে ধন্যবাদ দিয়েছেন। একবার আমার বড়ো শালা কলকাতায় বেড়াতে এসে অনেক টাকা উড়িয়েছিল। সেবার সে আমাকে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রিটের বড়ো একটা রেস্তোরাঁয়। সেখানে গিয়ে দেখি রামবাবু! একা বসে আছেন, হাতে সাদা স্বচ্ছ জিন, খুব স্বপ্নালু চোখ। সত্যি বলতে কী আমি ভাগ্যোন্নতির কথা বড়ো একটা ভাবি না। অন্তত সে কারণে রামবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা আমার মনেই হয়নি। আমি পুরোনো চেনা লোক দেখে এগিয়ে গিয়েছিলাম। রামবাবু ভ্রূ তুলে বললেন—কোথায় দেখেছি বলুন তো। মনেই পড়ছে না। তখন শালার সামনে ভীষণ লজ্জা করছিল আমার। লোকটা যদি সত্যিই চিনতে না পারে যদি সত্যিই তেমন অহংকারী হয়ে থাকে লোকটা—তবে আমার বেইজ্জতি হয়ে যাবে। তখন আমি মরিয়া হয়ে আমার ব্যাংকের নাম বললাম, বললাম যে আমি ক্যাশ-এ...সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার জিন-এর মতোই স্বচ্ছ হয়ে গেল তাঁর মুখ, প্রসন্ন হেসে বললেন—চিনেছি। কী জানেন, ওই ঘুলঘুলি আর ওই খাঁচার মধ্যে দেখতে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই হঠাৎ এ জায়গায়...বুঝলেন না! আসল কথা হলো ওই পারসপেকটিভ—ওটা ছাড়া মানুষের আর আছেটা কী যে, তাকে চেনা যাবে? ওই খাঁচার মধ্যে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে যেমন আপনি, তেমনি দেখুন এই কোট-প্যান্ট টাই আর টাক মাথা—এর মধ্য দিয়ে আমি। এসব থেকে যদি আলাদা করে নেন, তবে দেখবেন আপনি আর

আমি—আমাদের কোনো সত্যিকারের পরিচয়ই নেই। এই দেখুন না, একটু আগেই আমি পারসপেকটিভের কথাই ভাবছিলাম! ছেলেবেলায় আমরা থাকতাম রেলকলোনিতে। আমার বাবার ছিল টালিক্লার্কের চাকরি। কাটিহারে আমাদের রেল কোয়ার্টারে প্রায়ই পাশের বাড়ি থেকে একটি মেয়ে আসত, তার সৎ-মা বলে বাসায় আদর ছিল না। আমাদের বাসায় রান্নাঘরে উনুনের ধারে আমার মায়ের পাশটিতে সে এসে মাঝে মাঝে বসত। জড়োসড়ো হয়ে ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে পরোটা বেলে দিত, কখনও আমার কাঁদুনে ছোটো বোনটাকে কোলে করে ঘুরে ঘুরে ঘুম পাড়াত! মা আমাকে বলত—ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো। সেই শুনে সেই মেয়েটাকে আমি ভালো করে দেখতাম—আ কী যে নেশা লেগে যেত। কী করুণ কৃশ খড়িওঠা মুখখানা—আর কী তিরতিরে সুন্দর। যেন পৃথিবীতে বেশিদিন থাকবে বলে ও আসেনি। রামবাবু এটুকু বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, আর আমি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—তারপর কী হলো, সে কী মরে গেল? রামবাবু মাথা নাড়লেন—না না মরবে কেন। তাকে আমি বিয়ে করেছি বড়ো হয়ে। সে এখনও আমার বউ। ইয়া পেল্লায় মোটা হয়ে গেছে, বদমেজাজি, আমাকে খুব শাসনে রাখে। কিন্তু যখন দেখি ফ্রিজ খুলছে, গয়না হাঁটকাচ্ছে, চাকরদের বকছে কিংবা সোফারকে বলছে গাড়ি বের করতে, তখন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, এ সেই। সেই বেলী—যার অসুখের সময় মা দুটো কমলালেবু দিয়ে এসেছিল বলে এক গাল হেসেছিল। আজ দেখুন, খুব ঝগড়া করে বেরিয়েছি ওর সঙ্গে। মনটা খিঁচড়ে ছিল—সেই ভালোবাসা কোথায় উবে গেছে এখন। কিন্তু এখানে নির্জনে বসে সেই পুরোনো দিন, উনুনের ধারে বসে থাকা, ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে ওর বসার ভঙ্গি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আমার মায়ের মুখ—সে মুখ বড়ো মায়ামমতায় ওর বসার দীন ভঙ্গিটুকু চেয়ে দেখছে। অমনি আবার এখন ভালোবাসায় আমার মুখ ভরে উঠেছে। বাসায় ফিরে গিয়েই এখন ওর রাগ ভাঙাব। বুঝলেন না...বলে রামবাবু সেই সাদা স্বচ্ছ জিন মুখে নিয়ে হাসলেন, বললেন—ওই যে ঘুলঘুলিটা—যেটার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখি সেটাই আসল—ওই ঘুলঘুলিটা...

এই যে তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের ছেলেটা এখন পেমেন্টের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, পিতলের টোকেনটা ঠুকঠুক করে অন্যমনস্কভাবে ঠুকছে কাউন্টারের কাঠে, ও আমাকে চেনে। ওর বাবার আছে পুরোনো গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা। আগে ওর বাবা আসত, আজকাল ও আসছে ব্যাংকে। মাঝে-মধ্যে চোখে চোখ পড়লে আমি হেসে জিজ্ঞেস করি—কী, বাবা ভালো তো! ও খুশি হয়ে ঘাড় কাত করে বলে—হ্যাঁ—। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, একদিন যদি হঠাৎ করে এখান থেকে আমাকে সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং মোটামুটি সাধারণ চেহারার কোনো লোককে বসিয়ে দেওয়া হয় এ জায়গায়, তবে ও বুঝতেই পারবে না তফাতটা। তখনও ও অন্যমনস্কভাবে পিতলের টোকেনটা ঠুকবে কাঠের কাউন্টারে, অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থাকবে, চোখে চোখ পড়লে সেই নতুন লোকটার দিকে চেয়ে পরিচিতের মতো একটু হাসবে। ভুলটা ধরা পড়তে একটু সময় লাগবে ওর। কারণ, ও তো সত্যি কখনও আমাকে দেখে না। ও হয়তো ওর নতুন প্রেমিকাটির কথা ভাবছে এখন, শীগগিরই ও একটা স্কুটার কিনবে। ও ঘাড় ফিরিয়ে রিসেপশনের মেয়েটির দিকে কয়েক পলক তাকাল, তারপর ঘড়ি দেখল। একবার টোকেনটার নম্বর দেখে নিল, ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে দেখল আমার দু-খানা হাত ক্লান্তিকরভাবে মোটা একগোছা টাকা গুনছে। ও আমার মুখটা একপলক দেখেই চোখটা ফিরিয়ে নিল। কিন্তু আমি জানি যে, ও আমাকে দেখল না। আর পনেরো মিনিট পরে দুটো বাজবে। তখন আমি ক্যাশ বন্ধ করে নীচে যাব টিফিন করতে। তখন যদি ও আমাকে রাস্তায় দেখতে পায়, আমি ফুটপাথের দোকানে দাঁড়িয়ে থিন এরারুট আর ভাঁড়ের চা খাচ্ছি, তখন কি আমাকে চিনবে ও!

কলা কত করে হে? চল্লিশ পয়সা জোড়া—বলো কী? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মর্তমান যে তা আমি জানি, মর্তমান কি আমি চিনি না? ওই সুন্দর হলুদ রং, মসৃণ গা, প্রকাণ্ড চেহারা—মর্তমান দেখলেই চেনা যায়। তা আজ অবশ্য আমার কলা খাওয়ার তারিখ নয়। গতকালই তো খেয়েছি। আমি দু-দিন পর পর কলা খাই। দাও একটা। না, না ওই একটাই—এই যে কুড়ি পয়সা ভাই। আহা বেশ কলা। চমৎকার। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরও আমি অনেকক্ষণ খোসাটা হাতের মুঠোয় ধরে রইলাম স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। দশ-পনেরো মিনিট একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। কলার খোসাটা আমার হাতেই ধরা। আমার চারপাশেই নিরুত্তেজভাবে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। খুবই নির্বিকার তাদের মুখচোখ। এরা কখনও যুদ্ধবিগ্রহ করেনি, দেশ বা জাতির জন্য প্রাণ দিতে হয়নি এদের, এমনকি খুব কঠিন কোনো কাজও এরা সমাধা করেনি সবাই মিলে। জাতটা মরে আসছে আস্তে আস্তে, অন্তর্ভাবনায় মগ্ন হয়ে হাঁটছে, চলছে—একে অন্যের সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে। এদের সময়ের জ্ঞান নেই—উনিশশো উনসত্তর বলতে এরা একটা সংখ্যা মাত্র বোঝে, দু-হাজার বছরের ইতিহাস বোঝে না। এদের কাছে 'টেলিপ্যাথি' কিংবা 'ক্রিক রো' যেমন শব্দ, 'ভারতবর্ষ'ও ঠিক তেমনি একটা শব্দ।

দয়া করে, আমাকে দেখুন; এই যে আমি—অরিন্দম বসু—অরিন্দম বসু—এই যে না-লম্বা, না-রোগা, না-ফর্সা একজন লোক। আমি টেলিপ্যাথি নই, ক্রিক রো নই, ভারতবর্ষও নই—ওই শব্দগুলোর সঙ্গে অরিন্দম বসু—এই শব্দটার একটু তফাত আছে, কিন্তু তা কি আপনি কখনো ধরতে পারবেন?

যাক গে সেসব কথা! মাঝে মাঝে আমারও সন্দেহ হয়—আমি কি সত্যিই আছি? না কি, নেই? ব্যাংকের ওই ঘুলঘুলি দিয়ে লোকে হাত এগিয়ে টাকা গুনে নেয়, কেউ কেউ মৃদু হেসে ধন্যবাদ দিয়ে যায়। কিন্তু লোক বদল হলেও তারা অবিকল ওইভাবে হাত বাড়িয়ে টাকা গুনে নেবে আর কেউ কেউ ধন্যবাদ দিয়ে যাবে, খেয়ালই করবে না ঘুলঘুলির ওপাশে বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেই নিউ মার্কেটের ঘটনাটার কথাই ধরুন না—আমার বউ হেঁটে হেঁটে আমাকে খুঁজছে—আমাকে সামনে দেখে, চোখে চোখ রেখেও পেরিয়ে যাচ্ছে আমাকে, ভাবছে—কী আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়!

খুব যত্নের সঙ্গে কলার খোসাটা আমি ফুটপাথের মাঝখানে রেখে দিলাম! উদাসীন মশাইরা, যদি এর ওপর কেউ পা দেন তাহলে পিছলে পড়ে যেতে যেতে আপনি হঠাৎ চমকে উঠে আপনার সংবিৎ ফিরে পাবেন। যদি খুব বেশি চোট না পান আপনি, যদি পড়ো-পড়ো হয়েও সামলে যান, তাহলে দেখবেন আপনার মস্ত লাভ হবে। আপনি চারপাশে চেয়ে দেখবেন। কোথায় কোন রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটছেন তা মনে পড়ে যাবে। দুর্ঘটনা গুরুতর হলে আপনার হাত-পা কিংবা মাথা ভাঙতে পারত ভেবে আপনি খুব সতর্ক হয়ে যাবেন আপনার বিপজ্জনক চারপাশটার সম্বন্ধে। হয়তো আপনার ভিতরকার ঘুমন্ত আমিটা জেগে উঠে ভাববে 'বেঁচে থাকা কত ভালো'। তখন হয়তো মানুষের সম্বন্ধে আপনি আর একটু সচেতন হয়ে উঠবেন এবং বলা যায় না আপনার হয়তো এ কথাও মনে পড়ে যেতে পারে যে, আজ হচ্ছে উনিশশো উনসত্তর সালের ষোলোই জুলাই—আপনার বিয়ের তারিখ, যেটা আপনি একদম ভুলে গিয়েছিলেন এবং এই সালে আপনার বয়স চল্লিশ পার হলো। তখন মশাই ভেবে দেখবেন এই যুদ্ধ এবং বিপ্লবহীন ভারতবর্ষে একটি নিস্তেজ দুপুরে রাস্তায় কলার খোলা ফেলে রেখে আমি আপনার খুব অপকার করিনি!

আপনি কি এখন চাঁদের কথা ভাবছেন! আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা! ভাববেন না মশাই, ওসব ভাববেন না। কী কাজ আমাদের ওসব ভেবে। খামোকা মানুষ ওতে ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর তারপর ভীষণ অবসাদ আসে এক সময়ে। ওদের খুব ভালো যন্ত্র আছে, ওরা ঠিক চাঁদে নেমে যাবে, তারপর আবার ঠিকঠাক ফিরেও আসবে। কিন্তু সেটা ভেবে আপনি অযথা উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক হবেন না। রাস্তা দেখে চলুন। রাজভবনের সামনে বাঁকটা ঘুরতেই দেখুন কী সুন্দর খোলা প্রকাণ্ড ময়দান, উদোম আকাশ। কাছাকাছি যে সব মানুষগুলো হাঁটছে তাদের দেখে নিন, চিনে রাখুন যত দূর সম্ভব অন্যের মুখ—যেন যে-কোনো জায়গায় দেখা হলে আবার চিনতে পারেন। এই সুন্দর বিকেলে ময়দানের কাছাকাছি আমি আপনার পাশেই হাঁটছি—আমাকে দেখুন। এই তো আমি আমার অফিস থেকে বেরিয়েছি। একটু আগেই বেরিয়েছি আজ, খেলা দেখতে যাব বলে। মনে হচ্ছে আপনিও ওইদিকে—না?

দেখুন কী আহাম্মক ছেলেটা—অফসাইডে দাঁড়িয়ে সুন্দর চান্সটা নষ্ট করে দিল। আর মাত্র দশ মিনিট আছে, এখনও গোল হয়নি। আর ওই ছেলেটা—হায় ঈশ্বর, কে ওকে ওই লাল সোনালি জার্সি পরিয়েছে! ওকে বের করে দিক মাঠ থেকে। দিনতো মশাই আপনারা চোস্ত গালাগালিতে ওর ভূত ভাগিয়ে। আমার জিভে আবার খারাপ কথাগুলো আসে না। কিন্তু দেখুন, রাগে আমারও হাত-পা কাঁপছে! আজ সকাল থেকেই চাঁদ আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা ভেবে ভেবে আমার নার্ভগুলো অসাড় হয়ে আছে! তার ওপর দেখুন এই ফালতু টিমটা আমার দলের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে এক পয়েন্ট। একটা পয়েন্ট—কী সাংঘাতিক! ওদিকে আর আট কি ন-মিনিট সময় আছে মাত্র। কী বলেন দাদা, গোল হবে? কী করে হবে! ক্ষুদে টিমটার সব খেলোয়াড় পিছিয়ে এসে দেয়াল তৈরি করছে গোলের সামনে। আর এরা খেলছে দেখুন, কে বলবে যে গোল দেওয়ার ইচ্ছে আছে? ওই যে ছেলেটা—অফসাইডে দাঁড়িয়ে দিনের সবচেয়ে সহজ চান্সটাকে মাটি করে দিল—আমার ইচ্ছে করছে ওর সামনে গিয়ে বলি—এই আমাকে দেখো, আমি অরিন্দম বসু, এই টিমটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে সাপর্ট করে আসছি। জিতলে ঠাকুরকে ভোগ দিয়েছি, হারলে সুইসাইডের কথা ভেবেছি। তা বাপু, তুমি কি বোঝো সেসব? তুমি তো জানোই না যে, আমি—এই ভিড়ের মধ্যে বিশেষ একজন—কী রকম দুঃখ নিয়ে ছলছলে চোখে ঘড়ি দেখছি। অবশ্য তাতে কার কী যায় আসে। আমি কাঁদি কিংবা হাসি—কিংবা যাই করি—কেউ তো আর আমাকে দেখছে না।

না মশাই গোল হলো না। রেফারি ওই লম্বা টানা বাঁশি বাজিয়ে দিল। খেলা শেষ। এখন দয়া করে আমাকে একবার দেখুন কী রকম অবসাদগ্রস্ত আমি, কাঁধ ভেঙে আসছে। দেখুন আমার টিমটাকে আমি কত ভালোবাসি, কিন্তু তাতে টিমের কিছু যায় আসে না। ওরা চেনেই না আমাকে। অথচ আমি প্রতিটি হারজিতের পর কত হেসেছি-লাফিয়েছি-কেঁদেছি-চাপড়ে দিয়েছি অচেনা লোকের পিঠ। খামোকা। তাতে কারও কিছু এসে যায় না। এই যে সকাল থেকে চাঁদ আর তিনজন মানুষের কথা ভেবে চিন্তান্বিত—ভালো করে ভাত খেতে পারিনি উত্তেজনায়—এতেই বা কার কী এসে যায়।

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। না, আমি জানি, আপনি লিগ টেবিলে আপনার টিমের অবস্থা ভেবে বিব্রত। তার ওপর চাঁদ আর সেই তিনজন মানুষের কথাও ভাবতে হচ্ছে আপনাকে। কত কিছু ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে। সাড়ে উনত্রিশ ফুট লং জাম্প দিচ্ছে মানুষ, গুলিতে মারা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট, ভোটে হেরে যাচ্ছে

আপনার দল, বিপ্লব আসতে বড়ো দেরি করছে। তাই, আমি— অরবিন্দ বসু, ব্যাংকের ক্যাশ ক্লার্ক— আপনার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

ওই যে দোতলার বারান্দায় রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে আমার চার বছর বয়সের ছোটো ছেলেটা— হাপু। বড়ো দুরন্ত ছেলে। সকাল থেকে বায়না ধরেছে— রথের মেলায় যাব বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো। ওই যে এখন দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য। ঝাঁকড়া চুলের নীচে জ্বলজ্বল করছে দু-খানা চোখ, আমি এত দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি।

আমি সিঁড়িতে পা দিয়েছি মাত্র, ও ওপর থেকে দুড়দাড় করে নেমে এল— ওর মা ওপর থেকে চেঁচাচ্ছে— হাপু-উ কোথায় গেলি, ও হাপু—উ—উ। এক গাল হেসে হাপু ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রায়— কত দেরি করলে বাবা, যাবে না? হ্যাঁ মশাই, বাইরে থেকে ফিরে এলে— এই আপনজনদের মধ্যে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কচি ছেলেটাকে আমি কোলে তুলে নিলাম। ওর গায়ে মিষ্টি একটা ঘামের গন্ধ, শীতের রোদের মতো কবোষ্ণ ওর নরম গা। মুখ ডুবিয়ে দিলে মনে হয় একটা অদৃশ্য স্নান করে নিচ্ছি যেন! বললাম— যাব বাবা, বড়ো খিদে পেয়েছে, একটু বিশ্রাম করে খেয়ে নিই।

যতক্ষণ আমি বিশ্রাম করলাম ততক্ষণ হাপু আমার গায়ের সঙ্গে লেগে রইল, উত্তেজনায় বলল— শীগগির করো। ওর মা ধমক দিতেই বড়ো মায়ায় বললাম— আহা, বোকো না, ছেলেমানুষ! আসলে ওর ওই নেই-আঁকড়ে ভাবটুকু বড়ো ভালো লাগে আমার।

বড়ো দুরন্ত ছেলে। মেলায় পা দিয়েই হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চায়। বললাম—ওরকম করে না। হাপু, হাত ধরে থাকো, আমার হাত ধরেই তুমি ঠিকমতো মেলা দেখতে পাবে। ও কেবল এদিক-ওদিক তাকায় তারপর ভীষণ জোরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে—ওটা কী বাবা! আর ওটা! আর ওইখানে! আমি ওকে দেখিয়ে দিই— ওটা নাগরদোলা। ওইটা সার্কাসের তাঁবু। আর ওটা মৃত্যুকূপ।

আস্ত একটা পাঁপর ভাজা হাতে নাগরদোলায় উঠে গেল হাপু। ওই যে দেখা যাচ্ছে তাকে—আকাশের কাছাকাছি উঠে হি হি করে হেসে হাত নাড়ছে—সাঁই করে নেমে আসছে আবার—আবার উঠে যাচ্ছে—সারাক্ষণ আমার দিকে চেয়ে হাসছে হাপু। দেখে মন ভরে যায়।

মৃত্যুকূপের উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওকে দেখলাম দেয়াল বেয়ে ভীষণ শব্দে ঘুরে ঘুরে উঠে নেমে যাচ্ছে তীব্রবেগে মোটর সাইকেল। ও আমাকে আঁকড়ে ধরে থেকে দেখল।

তারপর আধঘণ্টার সার্কাস দেখলাম দুজন। দুই মাথাওলা মানুষ সিংগিং ডল, আট ফুট লম্বা লোক। হাপুর কথাবার্তা থেমে গেল। ঝলমল করতে লাগল চোখ।

বাইরে এনে ওকে ছেড়ে দিলাম। আমার পাশে পাশে ও হাঁটতে লাগল। ওর হাতে ধরা হাতটা থেমে গিয়েছিল বলে আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম।

ওই তো ও এগিয়ে যাচ্ছে আমার হাত ছেড়ে! দোকানে সাজানো একগাদা হুইশ্‌ল দেখছে ঝুঁকে, আবার এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় আর একটা দোকানে, যেখানে এরোপ্লেনের দৌড় হচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ও, এয়ার গান আর রংচং বল দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে পা ফেলছে....ক্রমে ভিড়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে হাপু.... আমি তখন আমার টিমটার কথা ভাবছিলাম—খামোকা একটা পয়েন্ট নষ্ট হয়ে গেল আজ। চাঁদের দিকে চলেছে তিনজন মানুষ—ওরা কি পৌঁছুতে পারবে?

হঠাৎ খেয়াল হলো, হাপুকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ভিড়ের মধ্যে এক সেকেন্ড আগেও ওর নীল রঙের শার্টটা আমি দেখেছি। তক্ষুনি সেটা টুপ করে আড়াল হয়ে গেল। হাপু-উ বলে ডাক দিয়ে আমি ছুটে গেলাম।

হ্যাঁ মশাই, আপনারা কেউ দেখেছেন নীল জামা পরা চার বছর বয়সের একটা ছেলেকে? তার নাম হাপু, বড়ো দুরন্ত ছেলে! দেখেননি? ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল জ্বলজ্বলে দুটো দুষ্টু চোখ....না, না, ওই পুতুলের দোকানের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে নয়—যদিও অনেকটা একইরকম দেখতে। না, তার চেহারার কোনো বিশেষ কিছু চিহ্ন আমার মনে পড়ছে না—খুবই সাধারণ চেহারা, অনেকটা আমার মতোই। কেবল বলতে পারি যে, তার বয়স চার বছর। আর গায়ে নীল জামা। তা নীল জামা পরা অনেক ছেলে এখানে রয়েছে, চার বছর বয়সেরও অনেক। না মশাই, আমার পক্ষে ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয় এত—এই হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে ঠিক কোন জন—ঠিক কোন জন আমার হাপু—আর বোধহয় হাপুর পক্ষেও বলা সম্ভব নয় এত জনের মধ্যে কোন জন—ঠিক কোন জন—বুঝলেন না, ওর মাও একবার ঠিক করতে পারেনি—। যদি হাপুকে দেখতে পান তবে ওকে একবার দয়া করে বলে দেবেন যে, এই যে আমি—এই আমিই ওর বাবা—। এই আমাকে একটু দেখে রাখুন দয়া করে—কাইন্ডলি, ভুলে যাবেন না—

**শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫) :** ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে ময়মনসিংহে জন্ম। পিতার রেলে চাকরির সূত্রে আশৈশব যাযাবর জীবন দেশের নানা স্থানে। স্কুলশিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা, পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা', প্রথম কিশোর উপন্যাস 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে— 'গোঁসাই বাগানের ভূত', 'নৃসিংহ রহস্য', 'পাগলা সাহেবের কবর', 'বক্সার রতন', 'হীরের আংটি', 'পাতালঘর' ইত্যাদি। বহু ছোটোগল্প লিখেছেন। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন ১৯৮৫ সালের 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার'। বড়োদের জন্য লিখেছেন— 'শ্যাওলা', 'মানবজমিন', 'দূরবীন', 'পার্থিব', 'চক্র' প্রভৃতি উপন্যাস। পেয়েছেন 'আনন্দ পুরুস্কার', 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার।

# আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি

## শঙ্খ ঘোষ

আমাদের ডান পাশে ধ্বস
আমাদের বাঁয়ে গিরিখাদ
আমাদের মাথায় বোমারু
পায়ে পায়ে হিমানীর বাঁধ
আমাদের পথ নেই কোনো
আমাদের ঘর গেছে উড়ে

আমাদের শিশুদের শব
ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে!
আমরাও তবে এইভাবে
এ-মুহূর্তে মরে যাব না কি?
আমাদের পথ নেই আর
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।

আমাদের ইতিহাস নেই
অথবা এমনই ইতিহাস
আমাদের চোখমুখ ঢাকা
আমরা ভিখারি বারোমাস
পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে
পৃথিবী হয়তো গেছে মরে
আমাদের কথা কে-বা জানে
আমরা ফিরেছি দোরে দোরে।
কিছুই কোথাও যদি নেই
তবু তো কজন আছি বাকি
আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।

**শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২) :**, অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের একজন প্রধান কবি, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক। পড়াশুনো প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি'। 'নিহিত পাতাল ছায়া', 'বাবরের প্রার্থনা', 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ', 'জলই পাষাণ হয়ে আছে', 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়', 'ধূম লেগেছে হৃৎ কমলে', 'গোটা দেশজোড়া জউঘর', 'প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে', 'হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ' ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য লিখেছেন— 'ছোট্ট একটা স্কুল', 'অল্পবয়স কল্পবয়স', 'সকালবেলার আলো', 'সুপুরিবনের সারি', 'শহর পথের ধুলো' ইত্যাদি। 'কুম্ভক' ছদ্মনামে লিখেছেন 'শব্দ নিয়ে খেলা' ও 'কথা নিয়ে খেলা'। প্রবন্ধের বই হিসেবে 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক', 'ছন্দোময় জীবন', 'ভিন্ন রুচির অধিকার', 'এই শহরের রাখাল', 'ঐতিহ্যের বিস্তার', 'এ আমির আবরণ', 'ছন্দের বারান্দা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কবির প্রাপ্ত নানা পুরস্কারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, কবীর সম্মান, সরস্বতী সম্মান এবং পদ্মভূষণ।

# আলোবাবু

## বনফুল

সবাই তাঁকে আলুবাবু বলত, কিন্তু তাঁর আসল নাম আলো। চেহারা অবশ্য নামের উপযুক্ত নয়। গায়ের রং কুচকুচে কালো, মুখটি বেগুন-পোড়ার মতো, তাঁর উপর কালো গোঁফ-দাড়ি, যুগ্ম-ভ্রু, মাথায় ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। গলায় তুলসীর মালা, সেটিও কালো হয়ে গেছে। পরনের থানখানি অবশ্য ধপধপে সাদা। গায়ের চাদরখানিও সাদা। আলুথালু জামা গায়ে দিতেন না, জুতোও পরতেন না।

একদিন সকালে আমার বৈঠকখানায় ঢুকে নমস্কার করে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই দিনই প্রথম দেখলাম তাঁকে।

কী চাই আপনার?

অনুগ্রহ করে একটু সাহায্য করবেন আমাকে?

সাহায্যপ্রার্থী অনেক আসে, অধিকাংশ লোকই টাকা চায়, ভাবলাম ইনিও বোধ হয় সেই দলের মনে মনে

একটু বিরক্ত হলাম, কিন্তু মুখ ফুটে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারলাম না। বরং বললাম, অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই করব। বলুন, কী করতে হবে —

তাঁর বাঁ হাতে একটি ছোটো থলি ছিল। তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে তিনি একটি ছোটো পাখির ছানা বার করলেন।

একটা ছোঁড়া এই পাখির ছানাটার পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি দু আনা পয়সা দিয়ে বাচ্চাটা নিয়ে নিয়েছি তার কাছ থেকে। মনে হচ্ছে এর পায়ে লেগেছে, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল কিনা, একটু দেখবেন দয়া করে? শুনেছি আপনি বড়ো ডাক্তার।

দেখলাম পাখির ছানাটিকে। পায়ে সত্যিই লেগেছিল। টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে বেঁধে দিলাম।

কী করবেন এটাকে নিয়ে, পুষবেন?

না। ভালো হলে ছেড়ে দেবো। জীবন্ত কোনো জিনিস পোষবার সামর্থ্য নেই আমার। ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু পয়সা নেই। সেই জন্যে বিয়েও করিনি।

কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে একটু হেসে চাইলেন আমার দিকে।

ও। এর আগে তো দেখিনি আপনাকে, কোথায় থাকেন?

অবিনাশবাবুর বাড়িতে। দিন সাতেক হলো এসেছি।

আর একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে চাইলেন। অবিনাশবাবু এখানকার নামজাদা উকিল একজন। অবিনাশবাবুদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বুঝি?

না, তেমন কিছু নয়। আমার এক দূর-সম্পর্কের ভাগনীর বন্ধুর শ্বশুর উনি। আসলে লোক খুব ভালো। তাই দয়া করে থাকতে দিয়েছেন। আলোবাবু পাখির ছানাটি নিয়ে চলে গেলেন।

দিন কয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি যেতে হয়েছিল। সেখানে আলোবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। দেখলাম তিনি একটি দিশি কুকুরের বাচ্চার পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়ে আছেন। আমাকে দেখেই এক মুখ হেসে বললেন, বিনুবাবুর কুকুর এটি। কুকুর পোষার শখ আছে কিন্তু সেবা করতে জানেন না, দুটো চোখে এতক্ষণ পিচুটি ভরতি ছিল, তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করলুম। আর কুকুরকে সারাক্ষণ বেঁধে রাখলে কি চলে? ওদের সঙ্গে খেলা করতে হয় —

কুকুরটার দিকে চেয়ে তার মুখের সামনে টুসকি দিতে লাগলেন। ল্যাজ নেড়ে নেড়ে খেলা করতে লাগল কুকুরটা। বিনু অবিনাশের ছেলে, বয়স দশ বছর।

অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হলো একটু পরে।

বললাম, আপনার এই আলোবাবু লোকটি তো অদ্ভুত ধরনের মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ, অদ্ভুতই। স্নেহের কাঙাল বেচারা। গরিবও খুব। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, এক পাখি-পেশেন্ট নিয়ে গিয়েছিলেন আমার কাছে।

দেখবেন তো, যদি ওর চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন কোথাও। সেবা করতে বড়ো ভালোবাসে, বিশেষত সেবার পাত্র বা পাত্রী যদি অসহায় হয় —

দিন কতক পরে সিভিল সার্জনের সঙ্গে দেখা হলো। একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলুম। কথায় কথায় আলোবাবুর কথা উঠে পড়ল। সিভিল সার্জন বললে, এখানকার হাসপাতালে ওকে প্রবেশনার ড্রেসার করে ঢুকিয়ে নিতে পারি। তবে দশ টাকার বেশি এখন পাবে না। পরীক্ষায় পাশ করলে তখন মাইনে বাড়বে —

আলোবাবু হাসপাতালের আউট-ডোরে রোগীদের ঘা ধোয়াতে লাগলেন। মাসখানেক পরেই কিন্তু চাকরিটি গেল তাঁর। একদিন আমার ল্যাবরেটরিতে এসে শুষ্ক মুখে বসে আছেন।

কী খবর —

আমাকে দূর করে দিলে।

কেন?

একটা লোকের পায়ের ঘা কিছুতেই সারছিল না। সে-ই আমাকে একটা ওষুধ দেখিয়ে দিয়ে বললে, ওই ওষুধটা দাও — তাহলে সেরে যাবে। ওটা লাগিয়ে অনেকের নাকি সেরে গেছে। দিলুম ওষুধটা লাগিয়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চিৎকার শুরু করে দিলে, সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার! ডাক্তারবাবু এলেন, তিনি তো চটেই লাল, বললেন, কার হুকুমে তুমি ঘায়ে কার্বলিক অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছ! আমি আর কী বলব, চুপ করে রইলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে দূর করে দিলেন। আমি ওর ভালোর জন্যেই ওষুধটা দিয়েছিলাম আর ওর কথাতেই দিয়েছিলাম—

আমি চুপ করে রইলাম, কী আর বলব! সত্যিই অন্যায় কাজ করেছেন।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আলোবাবু চলে গেলেন।

কষ্ট হতে লাগল ভদ্রলোকের জন্য, কিন্তু কী করব ভেবে পেলাম না।

দিন কয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকেও বিদায় নিতে হলো আলোবাবুকে। শুনলাম অবিনাশবাবুর স্ত্রী দূর করে দিয়েছেন তাঁকে। আলোবাবু যা করেছিলেন তা কোনও মা সহ্য করতে পারেন না। তিনি এক বগলে কুকুরের বাচ্চাটা এবং আর এক বগলে অবিনাশবাবুর শিশু-পুত্র তিনুকে নিয়ে একবার কুকুরটার মুখে আর সঙ্গে সঙ্গে তিনুর মুখে চুমু খাচ্ছিলেন।

অবশেষে আমিই আশ্রয় দিলাম আলোবাবুকে।

একদিন সন্ধের পর এসে দেখলাম তিনি একটা সোলার হ্যাট বাজিয়ে গুন গুন করে গান গাইছেন।

আপনি গান-বাজনা জানেন নাকি —

কুণ্ঠিতমুখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

এককালে ডুগি-তবলা বাজাতে পারতাম। দৈন্যের দায়ে সব বেচে দিতে হয়েছে। এখন হ্যাট বাজাই —

বলা বাহুল্য, খুব কৌতুক অনুভব করলাম।

হ্যাট পেলেন কোত্থেকে —

অনেক আগে স্যুটও পরতাম। সব গেছে, ওই হ্যাটটি আছে কেবল।

আলোবাবুর আরও পরিচয় পেলাম দিন কয়েক পর। একদিন দেখি তিনি ছুটতে ছুটতে আসছেন।

কী হলো, ছুটছেন কেন —

দশটা বেজে গেছে আমার ঘড়িতে দম দেওয়া হয়নি এখনও। রামবাবুর গাইটার বাচ্চা হয়েছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম তাঁর বৈঠকখানার ঘড়িতে টং টং করে দশটা বেজে গেল। তখুনি ছুটলাম, আমার ঘড়িতে ঠিক দশটার সময় দম দিই। আমাদের যেমন খাবার, ঘড়ির তেমনি দম, বেচারির খেতে দেরি হয়ে গেল আজকে —

তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। আলোবাবুর যে ঘড়ি আছে তা জানতাম না। তাঁর পিছু পিছু এসে একটু আড়াল থেকে দেখতে লাগলাম। দেখলাম ঘরে ঢুকেই তিনি নিজের ভাঙা তোরঙ্গটা খুললেন। তার ভেতর থেকে বার করলেন একটি ছোটো টিনের বাক্স। বাক্সের ভিতর থেকে একটা ন্যাকড়ার ছোটো পুঁটুলির মতন কী বার করলেন। ন্যাকড়াটি খুলতেই লালরঙের শালুর পুঁটুলি বেরিয়ে পড়ল। সেটি খুললেন। বেরুল রেশমি ন্যাকড়ার পুঁটুলি, সেটি খুলতেই বের হলো খানিকটা তুলো, তারপর ছোট্ট ঘড়িটি। তিন পুরু কাপড়-ঢাকা ঘড়িটিকে আঙুলের মতো রাখতেন তিনি সযত্নে। ঘড়িটি বার করে চাপটালি খেয়ে বসলেন, তারপর চোখ বুজে ধীরে ধীরে দম দিতে লাগলেন। মনে হলো যেন পুজো করছেন।

অবিনাশবাবুর কথাটা মনে পড়ল। স্নেহের কাঙাল বেচারা! জীবনে কিন্তু ভালোবাসার সুযোগ পাচ্ছে না কোথাও। সব স্নেহ তাই উজাড় করে দিয়েছে বোধহয় ঘড়িটির উপর।

একদিন ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে দেখি, আলোবাবু হ্যাট বাজিয়ে তারস্বরে গান গাইছেন। দুটো লাইনই বার বার গাইছেন —

আমায় ওরা সইলো না কেউ/আমার কাছে রইলো না কেউ—

আমি খনিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম অবাক হয়ে। এমন গলা ছেড়ে গান গাইতে শুনিনি কখনও তাঁকে। দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেলেন তিনি।

আজ এত জোরে গান গাইছেন যে!

এমনি।

তারপর আমার দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললেন, আমার ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে। ঠিক সময় হয়তো ভালো করে দম দিতে পারবে না —

টপ-টপ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা।

আলোবাবু এখন পাগলা গারদে আছেন।

সমাজের সঙ্গে নিজেকে তিনি খাপ খাওয়াতে পারলেন না কিছুতে।

**বনফুল (১৮৯৯—১৯৭৯) :** সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম 'বনফুল'। তাঁর জন্ম বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারীতে। সাহেবগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ার সময় ১৯১৫ তে তাঁর লেখা প্রথম কবিতা 'মালঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি 'বনফুল' ছদ্মনামে কবিতা লেখেন। পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড'। বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম ছোটোগল্পেরও জনক তিনি। ছোটোগল্প, নাটক, উপন্যাস—সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি সমান দক্ষ। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'হাটেবাজারে', 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'পশ্চাৎপট' রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী পদক' আর ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন।

# পৃথিবী বাড়ুক রোজ

নবনীতা দেবসেন

বিশ্ব ছোটো হয়ে যাক হস্তধৃত আমলকীর মতো,
এ আমার প্রার্থনীয় নয়। আমি চাই পৃথিবী ছড়াক
আমার পৃথিবী আমি পরিশ্রম করে খুঁজে নেব।
পৃথিবী, বিস্তীর্ণা হও, ব্যাপ্ত হও ব্রহ্মচরাচর,
আকীর্ণ ছড়িয়ে পড়ো, আরও, আরও নিঃসীম সময়
আমার পৃথিবী হোক অফুরান, অনন্ত বিস্তার
পৃথিবী, বর্ধিষ্ণু হও, আমি ছোটো, আরো ছোটো হই।

আমি ছোটো হতে হতে একগুচ্ছ রেশমের মতো
নরম ও নিরাকার, যৎসামান্য ইশারা পেলেই
নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে রাজপুতানি মখমলের শাড়ি —
আংটির ফোকর দিয়ে সবিনয়ে গলে চলে যাব।

পৃথিবী অনেক বড়ো, পৃথিবীকে ছোটো হতে নেই।

পশুপাখি উদ্ভিদেরা কিছুমাত্র বিস্মিত হবে না
ওরা সব জেনে গেছে, মানুষের বেশি দেরি নেই।

**নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮)** : কবি নরেন্দ্র দেব এবং সুলেখিকা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর কন্যা। কবিতা, গদ্য, ভ্রমণকাহিনি—সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'প্রথম প্রত্যয়'। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে— 'স্বাগত দেবদূত' ; 'আমি, অনুপম'; 'নটী নবনীতা'; 'খগেনবাবুর পৃথিবী'; 'গল্পগুজব'; 'মঁসিয়ে হুলোর হলিডে'; 'সমুদ্রের সন্ন্যাসিনী'; 'ট্রাকবাহনে ম্যাকমোহনে'; 'হে পূর্ণ তব চরণের কাছে' ; 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে'; 'নব-নীতা' প্রভৃতি। কৌতুকপ্রবণতা এবং অন্তরঙ্গ রচনাভঙ্গি তাঁর বৈশিষ্ট্য। বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার এবং শিশু সাহিত্যে 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' পেয়েছেন।

# আফ্রিকা

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা—
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।